২৪৬

সাক্ষরতা বুলেটিন

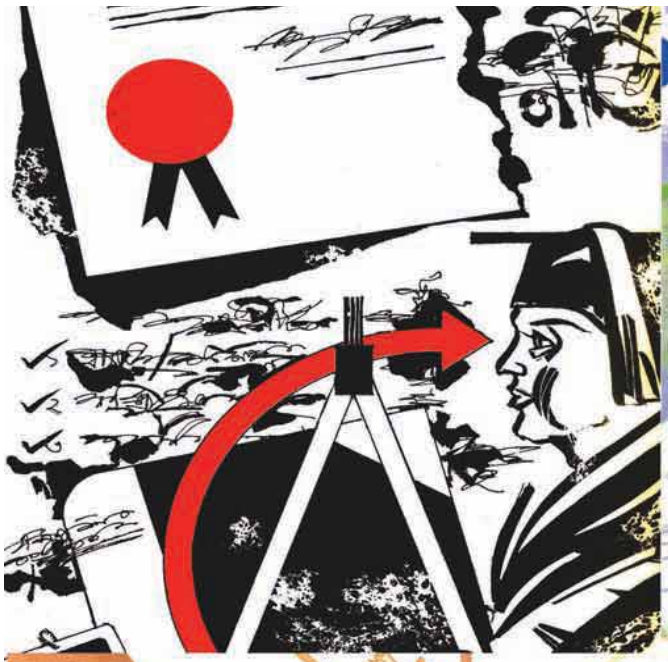

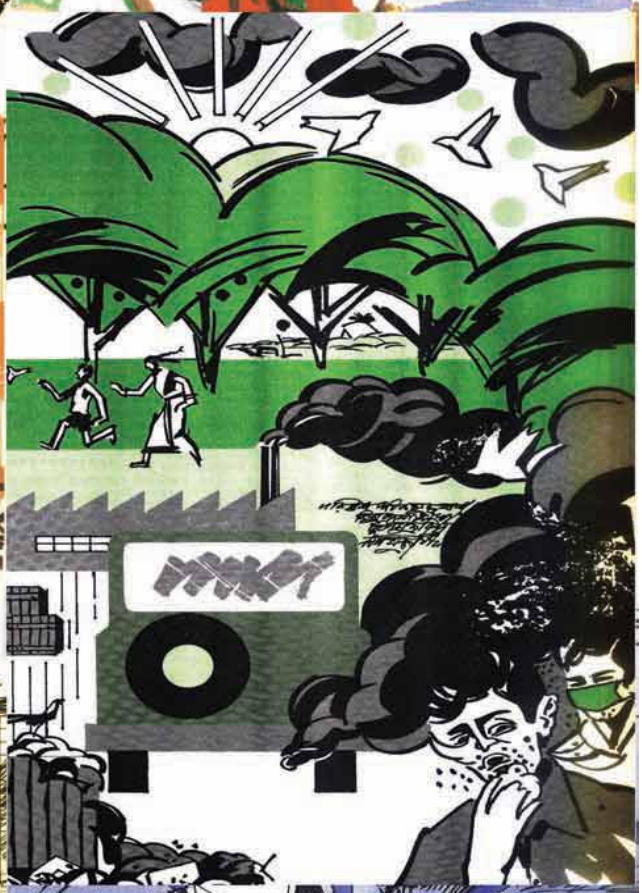

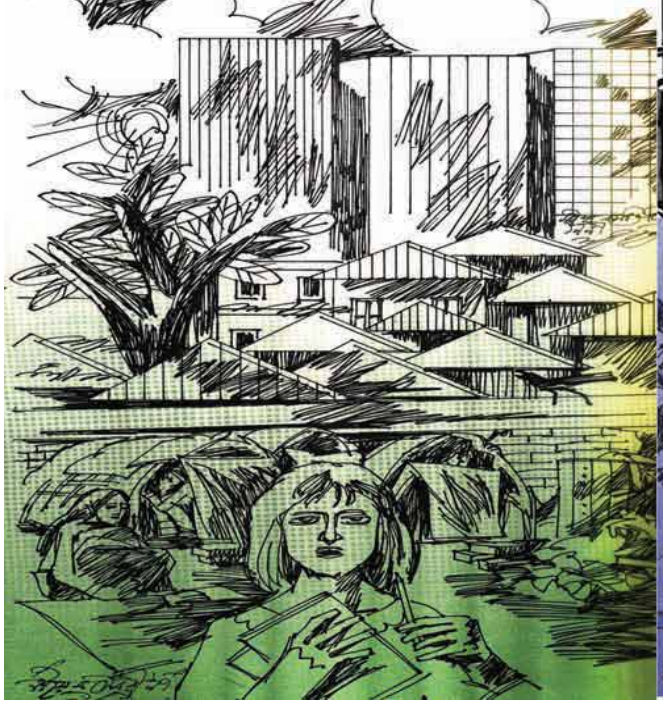

অগ্রহায়ণ ১৪২১
নভেম্বর ২০১৪

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৪৬ অগ্রহায়ণ ১৪২১ নভেম্বর ২০১৪

সূ চি প ত্র

৪ **শর্বরী আলোময়ী**
তাঁর প্রতি বিনম্র প্রণাম

৭ **মুস্তাফা নূরউল ইসলাম**
সেই তিনি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

১০ **শফি আহমেদ**
সান্ধ্য সমারোহে নিভে গেল দীপ

১২ **জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী**
শিক্ষা, একটি অব্যাহত সংলাপ

১৫ **সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ**
জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ও মানবতাবাদ: কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি

১৯ **মো. মাহমুদ হাসান রাসেল**
মানুষের জন্য নির্মিত সমাজ ও সমাজ কাঠামো:
বর্তমান প্রেক্ষাপট

২২ **শাহ মো. জিয়াউদ্দিন**
বিশ্ব শিক্ষক দিবসের দুই দশক এবং আমাদের শিক্ষা

২৫ **বিশেষ প্রতিবেদন**
বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৪

২৭ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

তিনি ঠিক নিভৃতচারী ছিলেন না, আবার অন্য অনেকের মত মিছিলের অগ্রভাগে এসে তাঁর উপস্থিতির অনিবার্যতাকে জানিয়েও দিতেন না। তিনি যে আমাদের মধ্যে আছেন, এই সত্যটাই আমাদের মধ্যে সাহসের বীজ বুনে দিত, অনেক সম্ভাব্য পচনশীলতা থেকে আমাদের সুরক্ষা দিত। প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ-এর মৃত্যু আমাদের সেই সাহসের জগতটার ওপর মেঘের কালো ছায়া ছড়িয়ে দিল। মুক্তচিন্তা, উদারবাদী সমন্বয়বাদী সমাজগঠনের ভাবনা এবং সমাজকে তার ঐতিহ্যিক অবয়বে চিহ্নিত করার অনুশীলন শিখেছি আমরা তাঁর কাছ থেকে। বাঙালির ইতিহাসচর্চার এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চিরতরে হারিয়ে গেলেন। অজাতশত্রু এই শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ভাষাও যেন আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

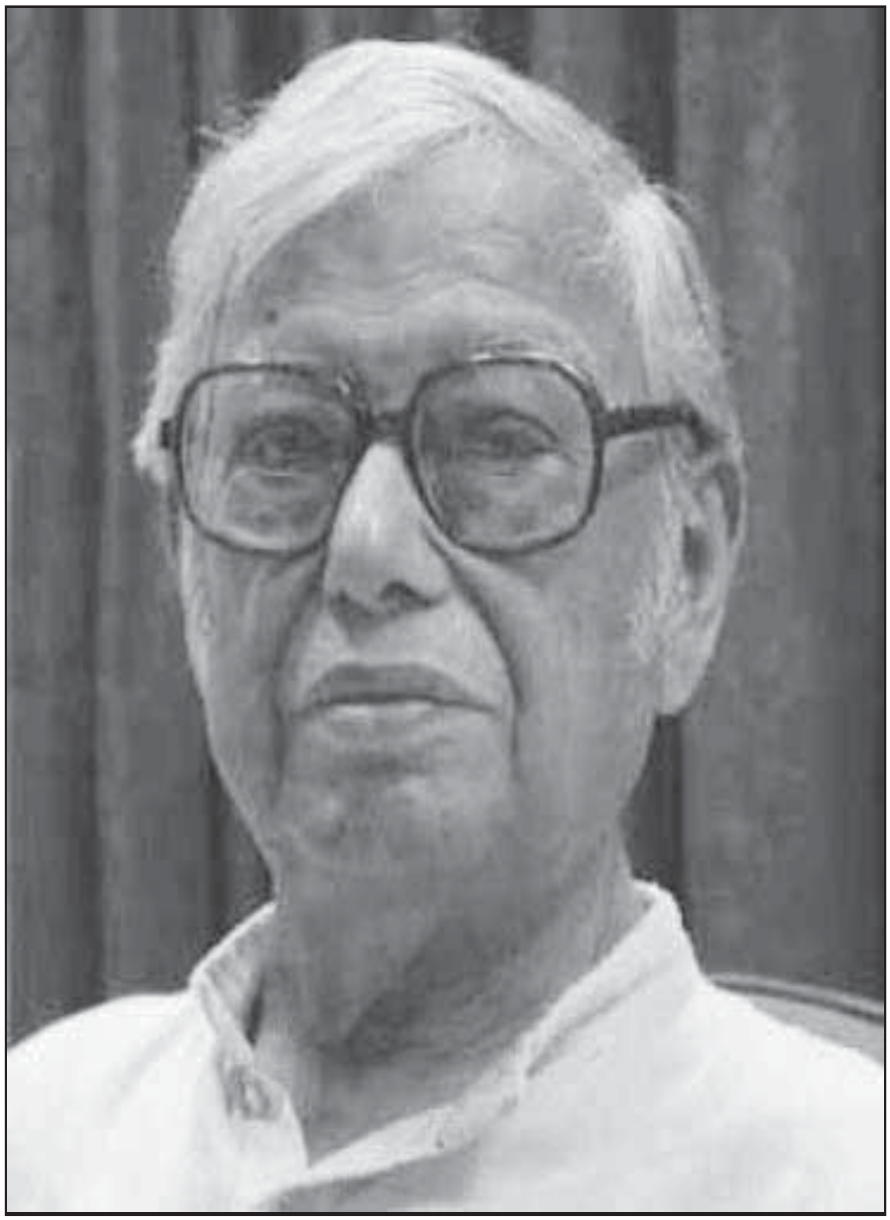

শ র্ব রী আ লো ম য়ী

তাঁর প্রতি বিনম্র প্রণাম

যে বয়সে চলে গেলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষক প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহ্‌মদ, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে আবশ্যিকভাবেই অকালপ্রয়াত বলা যাবে না। পরিণত বয়সেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন অর্মত্যলোকে। কিন্তু তারপরও এই মৃত্যুর আকস্মিকতা কী গভীরভাবে স্তব্ধ করে দিয়েছে আমার মত তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহীকে। এমন সর্বজনপ্রিয় একজন মানুষের অন্তিম বিদায়ের জন্যে আমাদের বোধ হয় কিছুটা মানসিক প্রস্তুতির দরকার হয়। কিন্তু কী অবাক হওয়ার মত বিষয় যে, বিগত কিছু কালে আমাদের বেশ কয়েকজন স্বজন, অবিসাংবাদিত অভিভাবক, আমাদের সমাজের চলমান অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা প্রণম্য কয়েকজন তর্কাতীত বড় মাপের মানুষ হঠাৎ করেই, কোন রকমের জানান না দিয়েই চলে গেলেন, আমাদের দৈন্যদশাকে বিপুলভাবে বাড়িয়ে দিয়ে তারা ছিন্ন করে দিলেন সব পার্থিব সম্পর্ক।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরীও পরিণত বয়সে জীবনের ইতি টেনেছেন, শেষ দিকে চলাফেরা, মানুষের ভিড়ের মধ্যে যোগ দেয়া প্রভৃতি সীমিত হয়েছিল কিছুটা, কিন্তু ঘরোয়া জীবনযাপনে তেমন কোন সমস্যা ছিল না তাঁর, শরীরে বাসা বাঁধেনি কোন দুরারোগ্য ব্যাধি, কোনরকমের কষ্টে ভুগছিলেন না তিনি, তবুও এক সকালে হঠাৎ করেই এই সংবাদ এসে হিমেল উত্তরা বাতাসের মত শরীর-মনকে অবশ করে দিয়ে জানিয়ে দিল, কবীর চৌধুরী আর নেই। নির্বাক স্থিরতায় এই সংবাদের আছড়ে পড়া আঘাতে মুহ্যমান হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

কী অসাধারণ এক মানুষ ছিলেন বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। এমন ধীমান এবং সাহিত্য-ইতিহাস-সংস্কৃতি-ধর্মচিন্তা বিবিধ বিষয়ে অধ্যয়নের সীমাটা প্রতিদিন অতিক্রম করে যাওয়া ব্যক্তি আমাদের সমাজে একান্ত বিরল। যে বয়সে তাঁর মত সাফল্যের সোপান পেরোনো ব্যক্তিরা বড় জোর কোন এক অনুলেখকের সহায়তায় আত্মজৈবনিক ঘটনার তালিকা তৈরি করেই কর্তব্যের দায়ভার মিটিয়ে থাকেন, তখনো বিচারপতি হাবিবুর রহমান প্রতিদিনই কোন না কোন বিষয়ে কিছু লিখছেন এবং তা-ও কোন সাধারণ বিষয়ে নয়, সর্বদাই জ্ঞানের অলিগলির রহস্য ভাণ্ডার থেকে ছেঁকে আনছেন তেজোদীপ্ত আলো। সেই তিনি, যিনি দেখা হলেই সহাস্য বদনে রসিকতার সঙ্গে বুদ্ধির জৌলুস ছড়িয়ে কুশল বিনিময় করতেন, তিনি আমাদের সবাইকে প্রায় বিমূঢ় করে দিয়ে, রাতের আঁধার ঘন হয়ে ওঠার আগেই টেলিভিশনের চলমান সংবাদধারায় নিষ্ঠুরতম খবরের অন্যতম অংশ জুড়ে হয়ে আমাদের ভেতরটা অসহায়ভাবে ঝাঁকিয়ে দিলেন, অসহনীয়ভাবে, না, এর জন্যে আমরা একটুও প্রস্তুত ছিলাম না। কয়েক ঘন্টা দেরি করলেও হয়ত বুঝতে পারতেন কী বিপুল ভালোবাসার আধার ছিলেন তিনি। বিনামেঘে বজ্রপাতের চেয়েও আরও কোন প্রবচনের বড় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আর প্রফেসর সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ! যখন খবরটা জেনেছি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের ফোন মারফৎ, তখন সূর্যটা পুব থেকে দক্ষিণের দিকে অনেকটা সরে গেছে। তিনিও তো কোন বড় রকমের কষ্টকর রোগে ভুগছিলেন না। বয়স হয়েছিল, একাই থাকতেন, শরীরটা দুর্বল হয়েছিল, সে-ও নেহাতই বার্ধক্যের কারণে, তাই বিগত দুই তিন বছরে বাইরে আসাটা কমিয়ে দিয়েছিলেন। তা-ও বেরোতেন, যেসব সভায় যাওয়ার মধ্যে তাঁর অন্তর্গত অঙ্গীকার থাকতো অথবা প্রিয়জনের যে অনুরোধ রাখতে তাঁর ভেতর থেকেই সাড়া জাগতো, প্রফেসর সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ সেসব জায়গায় উপস্থিত থাকতেন।

যাঁরা কাছ থেকে তাঁকে দেখেছেন, বুঝতেই পারতেন তার উপস্থিতি ও সান্নিধ্যের স্বাতন্ত্র্য। তিনি ছিলেন মিতবাক, মৃদুবাক, স্থিতবাক এবং অনুচ্চবাক। কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁকে অন্তর্মুখী বলা যাবে না, নিজেকে ঠিক গুটিয়ে রাখতেন না। আবার তাঁর সমসাময়িক অথবা অনুজ অনেক বুদ্ধিজীবীকে যেমন দেখা যায়, তাদের উপস্থিতিকে জানিয়ে দেবার জন্য কণ্ঠের তীব্রতার মাত্রা বৃদ্ধি করেন, নেতৃত্বের একটা আবহ সৃষ্টিতে সজাগ ও তৎপর; সরকার, সংবাদপত্র ও বিভিন্ন গণমাধ্যম তাদের ছবি তুলতে অনেক আগ্রহী, তাদের সাক্ষাৎকার নেবার জন্য সভাস্থলে বা শহীদ মিনারে সংবাদকর্মীরা ছোটাছুটি করেন। প্রফেসর সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ ওই গোত্রভুক্ত মানুষ ছিলেন না।

সে কারণেই অন্যান্য বুদ্ধিজীবী নেতাদের সাধারণ মানুষ যেমন করে চেনেন, তিনি তেমন পরিচিত ও জনপ্রিয়তা লাভ করেননি। অবশ্যই এতে তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি এবং আমরা যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি, তাঁর স্নেহের রাজ্যের বাসিন্দা, খুব সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারি এ নিয়ে তাঁর কোন ধরনের আক্ষেপ ছিল না। দেশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কথা বলার জন্য তাঁর মাপের তুলনায় অনেক বামনকে গণমাধ্যম থেকে খুঁজে বেড়ানো হয়, কিন্তু সালাহ্উদ্দীন আহ্মদের ভাষ্য বা অভিমত প্রচার করার জন্য তাদের তৎপরতা লক্ষ করা যায়নি। এই ঢাকায় কত না সভা হয় প্রতিদিন, প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ হয়ত উপস্থিত থেকেছেন তার মধ্যে একটি বা দু'টিতে, সারা বছরে। আমার অকালপ্রয়াত বন্ধু কবি-অধ্যাপক খোন্দকার আশরাফ হোসেন লঘু স্বরে একটা কথা বলতেন, 'আমাদের দেশে কিছু মানুষ আছেন, তাঁদের দেখে মনে হয়, তারা যেন সভাপতি হবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করেছেন।' বলা বাহুল্য, সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ সেই দলভুক্ত নন।

কিন্তু এই শব্দাবলি রচনা করার সময় তাঁর সেই যে পরম সুশোভন উদার মুখশ্রী আমার মনের মুকুরে ভেসে উঠেছে, তার মধ্যে যেন চিরায়ত সারস্বত ভাবনার একটা সজীব এবং মূর্ত রূপ ফুটে ওঠে। অবশ্য আমার এমন মন্তব্যের মাধ্যমে আমি অন্যান্য চেনামুখ বুদ্ধিজীবীবৃন্দকে খাটো করে দেখছি, তা ভাবলে ভুল হবে। প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদের চরিত্রটাও ছিল ওইরকম। মানুষের সঙ্গে মিশতে অনুরাগ ছিল না, তা বলা যাবে না। ছোট বড় সবাইকে গভীর মমতা ও ভালোবাসায় কাছে টেনে নিতে পারতেন।

দেশে যে এত রকম অনাচার হচ্ছে, ইতিহাস-বিকৃতি চলছে, বাঙালি সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত হচ্ছে, মৌলবাদী চিন্তা-চেতনার উত্থান ঘটছে, জাতীয় পতাকা যে খুঁটির ওপর উড্ডয়নমান, তার চূড়ায় বসে শকুন রোদ পোহাচ্ছে, এসব বিষয়ে দেশে বেশ উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ হয়েছে; তার কিছুটা সুফল হয়ত পাওয়া গেছে, যতটা আশা করা হয়েছিল, তা হয়ত হয়নি; সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ এই সবকিছুর এক সংক্ষুব্ধ সাক্ষী। অন্যদের মত ক্ষোভ প্রকাশ করতে হয়ত লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েননি। কিন্তু ব্যক্তিগত সূত্রে জানি, তাঁর আস্থাভাজন দু'চারজন ছিলেন, যাদের তিনি এমন অনুমতি দিয়েছিলেন, প্রগতিপন্থার পক্ষে যে কোন বিবৃতিতে তার স্বাক্ষর জুড়ে দিতে যেন তারা দ্বিধা না করেন।

সাধারণভাবে, সৌম্যকান্তি প্রশান্ত মুখমণ্ডলের এই মানুষটি ছিলেন সমকালীন ইতিহাস পঠন-বিশ্লেষণে এক অক্লান্ত শিক্ষাব্রতী। অধ্যাপক সুশোভন সরকারের যথার্থ ছাত্র তিনি। বাঙালি সমাজের উদারনৈতিক বহুত্ববাদী চরিত্রটা অনুসন্ধান করতে এবং তার প্রতিষ্ঠাকল্পে যে ঐতিহাসিক মতধারাকে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন, সে বিষয়ে সর্বদাই কথা বলতেন। অনেকদিন বেশ দীর্ঘ সময় ধরে তার বাসায় নানা বিষয়ে কথা হয়েছে।

তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, সেসময় কোনদিন তাঁর বাসায় যাবার সাহস হয়নি। পরে বুঝেছি, ওই ভয় ছিল অমূলক। ১৯৭৩ সালে চলে এলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। থাকতেন নীলক্ষেতে পেট্রল পাম্পের পেছনে। ওঁর স্ত্রী ছিলেন গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের অধ্যক্ষ। নিঃসন্তান দম্পতির অবিমিশ্র ঝোঁক পড়াশোনার প্রতি।

সত্তরের দশকের ঠিক মাঝামাঝি বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হবার পর বুঝতে পারলাম, কী গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তার হৃদয়ের ভেতর। সে শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসের ওই মহানায়কের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য নয়; তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে যেসব অসাধারণ অর্জন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রধান উপাদান ছিল, সেইগুলো যেন ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করবে। সেই সময় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যা বুঝেছি এবং আমাদের সকলেরই বোধ সেইকালে এবং উত্তরকালে, তা হল দেশটা শুধু রাজনীতি ও গণতন্ত্রচর্চায় পিছিয়ে পড়বে না, প্রশাসনযন্ত্রের ওপর পাকিস্তানী কায়দায় সামরিক বাহিনীর আছর ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠবে। প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ নিশ্চুপ থেকে অনেকের কাছেই তার শঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন।

আমার আর এক বন্ধু আমাকে জানিয়েছিলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম জামাতপন্থী এক শিক্ষকের নিয়োগ প্রাপ্তির পর তিনি কী ভীষণভাবে বিচলিত বোধ করেছিলেন। নিজে অমন activist ছিলেন না, তাই অনুজ সহকর্মীদের নিজের বাসায় ডেকে তা প্রতিরোধ করার পন্থা বাতলে দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, তা কাজে লাগেনি। কিছু চেনামুখ বুদ্ধিজীবী এই প্রতিরোধ উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানাতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ খুব বেশি লেখেননি। সেটা আমাদের জন্য পরম দুর্ভাগ্যের। সাধারণ পাঠক তাঁর মনের নাগাল তেমনভাবে পাবেন না। কিন্তু তিনি তাঁর অনুসারী কয়েক গুচ্ছ বিবেকবান, স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন, মৃত্তিকাসংলগ্ন, উদার চিন্তায় বিশ্বাসী ও দেশ এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ ইতিহাসবিদ সৃষ্টি করে গেছেন তিনি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যোগদানের পর তাঁর নেতৃত্বে এবং ড. এ আর মল্লিকের সমর্থনে যে ইতিহাসের পাঠক্রম পুনর্চয়ন করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাস ও সভ্যতা, প্রত্নতত্ত্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পুনর্পাঠে তা ছিল প্রায় বৈপ্লবিক।

তার প্রতি গভীর ও বিনম্র প্রণাম জানাই।

শর্বরী আলোময়ী
শিক্ষক ও সংস্কৃতিকর্মী

অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের এক উল্লেখযোগ্য নাম। সুদীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন অসংখ্য গুণমুগ্ধ ও সার্থক শিক্ষার্থী, আমাদের সমাজে যারা সাংস্কৃতিক সুরুচি নির্মাণ ও বিদ্যাচর্চার অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন। প্রফেসর সিদ্দিকী ছিলেন বুদ্ধিজীবী মহলের এক অগ্রগণ্য সারথী। সমাজের বিভিন্ন সংকটে তিনি প্রতিবাদী কণ্ঠের শক্তি বৃদ্ধিতে এগিয়ে এসেছেন। আমাদের সংস্কৃতির মূলধারার প্রতিনিধিত্ব করেছেন নিজের সাহিত্য সৃজনে ও পেশাগত দক্ষতায়। কবিতা লিখেছেন; সাহিত্য বিষয়ে চিন্তা উদ্রেককারী প্রবন্ধ লিখেছেন, অননুকরণীয় গদ্য সৃষ্টি করেছেন, সুশিক্ষায় পরিণতিমনস্ক করে তোলার চেষ্টা করেছেন একাধিক প্রজন্মের শিক্ষার্থীকে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু আমাদের হতবাক করেছে, আমাদের দৈন্য বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর প্রতি আমাদের সবিনয় শ্রদ্ধার্ঘ্য।

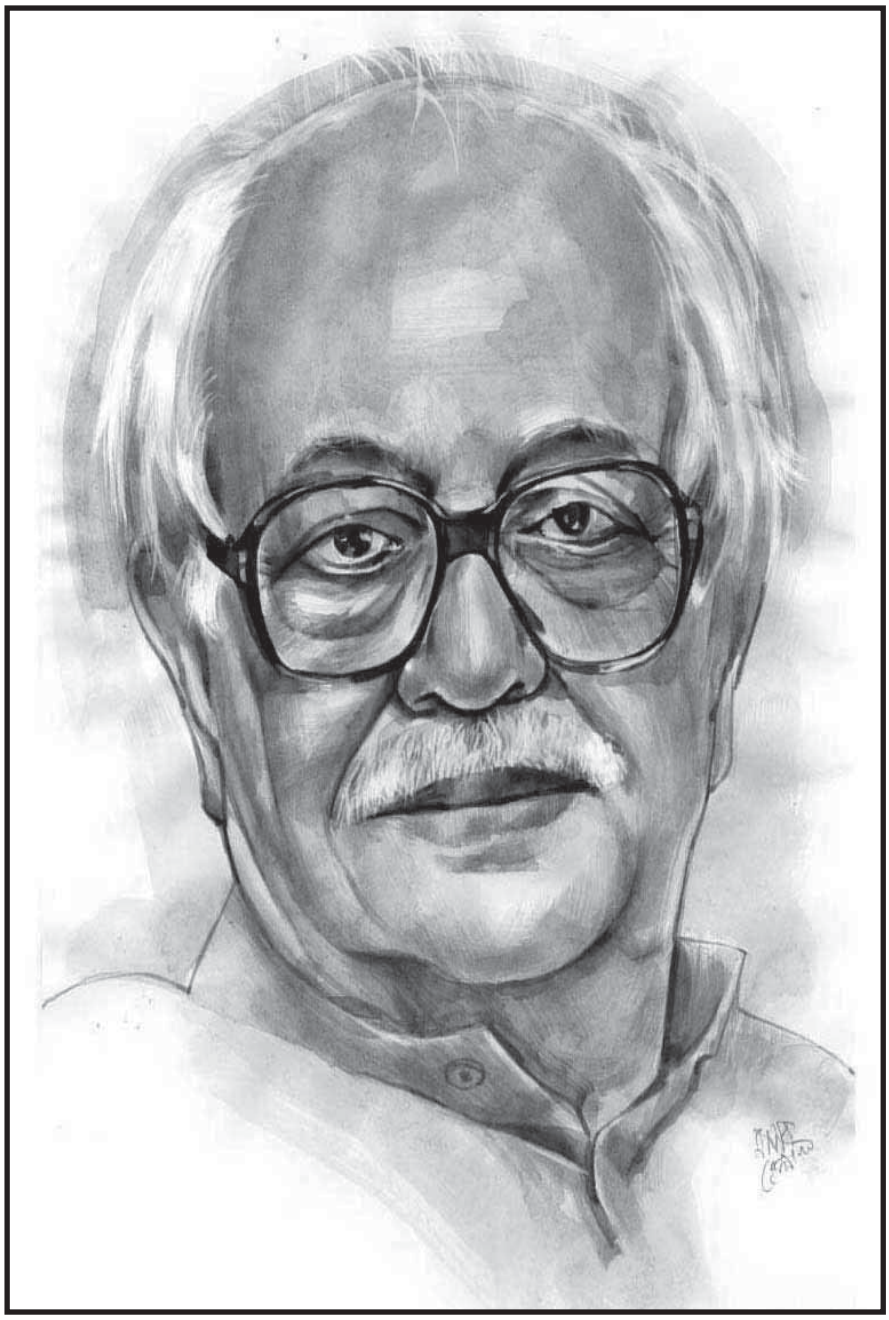

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

সেই তিনি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

সদ্য প্রয়াত হলেন দেশের অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব, নামে যিনি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। সময়টা কি খুবই ট্র্যাজিক যাচ্ছে? যেন বা একে একে নিভিছে দেউটি। এই সেদিন হারালাম আমাদের গৌরবের অন্যতম প্রতিনিধি জাতীয় অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ ড. সালাহ্উদ্দিন আহ্মেদকে। তারপর কটা দিনই বা গেল, অনন্তধামে পাড়ি দিলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। আমাদের এমনতরই দুর্ভাগ্য, কী যে অতল শূন্যে অবস্থান আমাদের।

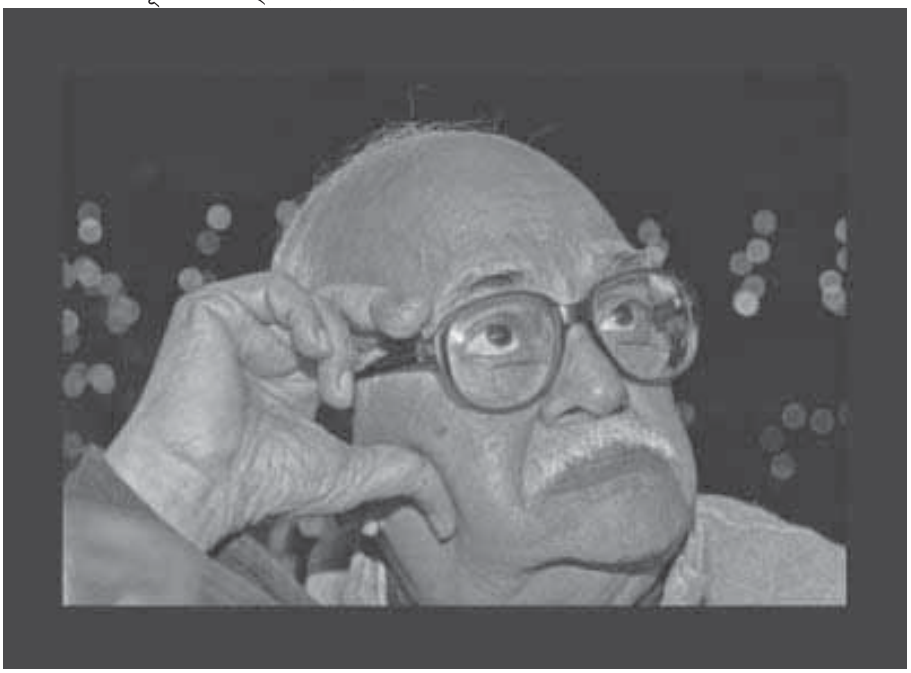

কেমন যে লাগছে প্রায় সাড়ে ছয় দশকের মতো কাল আমরা কাটিয়েছি একসঙ্গে- আমি ও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। এখন তিনি হারিয়ে গেলেন আরেক ধামে। স্বভাবতই একান্ত করে স্মৃতিচারণায় পেয়ে বসেছে আমাকে। হা-হুতাশ করব, না স্মৃতিচারণা করব, কিংবা মূল্যায়ন করব সেই তাঁকে-বুঝে উঠতে পারছি না। তবে প্রতিভার বরপুত্র জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে যথার্থ অর্থে তাঁর তাবৎমাত্রিকতাসহ মূল্যায়নের অবকাশ এই ক্ষণে মোটেই নেই বলেই মনে করি। সে জন্য সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু হুতাশেই বা ফায়দাটা কী? সে তো নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার চাইতে খানিকটা হলেও স্মৃতিচারণার প্রয়াস পাওয়া যাক। আজকের দিনের প্রজন্মের কাছে বরং তাঁকে খানিকটা হলেও তুলে ধরতে চাই।

সময়টা বোধ হয় গত শতাব্দীর চল্লিশ দশকের শেষভাগ। তখন সবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে নাম লিখিয়েছি। আমি ও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী - আমাদের পারস্পরিক পরিচিতির, কাছাকাছি আসবার দিনগুলো সম্ভবত আরও কিছুটা পরের। তাঁর সম্পর্কে শোনাটাই পয়লা, খ্যাতি শুনতাম কলকাতা থেকে এখানে এসেছে এক মেধাবী ছাত্র, সে ইংরেজী বিভাগের। পাশাপাশি ঘরে আমরা তখন পড়ি বাংলা বিভাগে। খুবই নামকরা ছাত্র জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সঙ্গে শুরুতে সেইটে সেতুবন্ধ। তবে মুখোমুখি পরিচয় লেখালেখির মাধ্যমে। সিদ্দিকী সাহেব কখনোই তেমন অড্ডাবাজ ছিলেন না। তাঁর বিচরণ প্রধানতই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও শ্রেণিকক্ষে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়ের কথাটা যে বললাম, যতটা মনে পড়ছে সেটা হয়েছিল মধুর চায়ের দোকানে, ইংরেজি বিভাগেরই অন্যতম ছাত্র কবি শামসুর রাহমানের মাধ্যমে। শামসুর রাহমান সে সময় আমাদের অড্ডায় ঘনিষ্ঠ এক সতীর্থ। সেকালে এবং বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি বেশ রোমান্টিক কবিতা লিখতেন। তিনিই একই বিভাগের জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে টেনে এনেছিলেন আমাদের ওই আড্ডায়।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে প্রথম দেখায় মনে হলো লাজুক প্রকৃতির ছেলেটি স্বভাবতই নম্র। অন্য সূত্রে জানা গিয়েছিল,

নবাগত তিনি কবিতা লিখে থাকেন । তাই স্পষ্টই মনে পড়ছে, আমাদের সবার চাপাচাপিতে ওই 'নবাগত' জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী নিজের লেখা একটি কবিতা পাঠ করেছিলে সেদিন। তাঁর সে কবিতাটি ছিল ভারি রোমান্টিক। সে সময়টায় আমাদের মধ্যে বাম ধারার আন্দোলনের ও লেখালেখির ঢেউ। আবারও বলি, তবু সেদিন পঠিত এই কবিতাটি মনের মাঝে নতুন আবেগের নাড়া দিয়েছিল। তার পরের থেকে লেখালেখির সড়কে আমাদের পথচলা। এর মধ্যে সময়ের টানে কখন যে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

এদিকে সব ছাপিয়ে এসেছে ভাষা আন্দোলনের জোয়ার। নিত্য গ্রন্থাগারে পাঠরত, শ্রেণিকক্ষে নিবিষ্ট মেধাবী ছাত্র, পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফলের অধিকারী জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি তিনিও যে কখন জড়িয়ে পড়েছেন আমাদের সঙ্গে একই কাতারে।

স্মৃতিচারণার পয়লা পালার কথা বললাম এতক্ষণ। এইখানেতে খানিকটা ছাত্ররাজনীতির কথাও এসে পড়ে। আমি নিজে যে বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলের নির্বাচিত সহসভাপতি, পরের বছরেই ওই একই হলের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে আরও কত স্মৃতি আছে, সব আজ আর মনেও নেই। আসলে আমাদের দুজনের এত দীর্ঘকালের পথচলা, স্মৃতিচারণা, এ তো প্রায় মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের বৃত্তান্ততুল্য। আজকের অবকাশে তাতে কাজ নেই।

বরং এখন তবে দ্বিতীয় পালায় আসা যাক। এর মধ্যে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর জীবনেও স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে যাওয়ার মেলা কিছু ঘটেছে। আমার নিজের জীবনেও ওলট-পালট কম নয়। ছাত্রজীবনের পর কিছুদিনের জন্য হলেও আমরা দুজন দুই ভুবনের বাসিন্দা। সিদ্দিকী সাহেব বরাবরই লেখাপড়ায় এক ধাপ থেকে আরেক উচ্চতর ধাপে; দেশের সীমানা পেরিয়ে অক্সফোর্ডে তিনি পড়াশোনা করলেন। আর আমার বেলাতে হাতেখড়ি হলো সাংবাদিকতায়, এরপর যুক্ত হই অধ্যাপনার সঙ্গে।

এরপর আবারও আমি আর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী-আমরা একই কাতারে-সেইটে অধ্যাপনার অঙ্গন। আমাদের ওঠাবসা, কাজকর্ম, অধ্যাপনা, লেখালেখি-সবকিছুই জীবনভর বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম কয়েক বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, তার পরের থেকে শেষতক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। যে কয়েক বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম, সেই সময়টায় অর্থাৎ গত শতকের ষাটের দশকে দেশজুড়ে আন্দোলন- আমরা সবাই জড়িয়ে পড়েছি পাকিস্তানি আগ্রাসনের মোকাবিলায়-চাই বাঙালিত্বের প্রতিষ্ঠা, বাঙালিত্বের জয়। আর এখানে রয়েছেন অবশ্য করেই জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীও। এ সময় শুরু হলো রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও এই দেশে রবীন্দ্র সঙ্গীতচর্চার উদ্বোধনের কর্মযজ্ঞ। সেই ইতিহাসের ধারায় বারংবার দেখি সিদ্দিকী সাহেবের মুখ। এসব অলমিতি বিস্তরেণ।

তবে এই রাজশাহী পর্বে বিশেষ করেই জানাই, আমাদের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত সেই বিশেষ পত্রিকাটির কথা-*পূর্বমেঘ*। অত বছর আগে ঘোরতর সেই মফঃস্বল শহর রাজশাহী থেকে অমন মানের একটি সাহিত্য পত্রিকা দশ-বারো বছর ধরে নিয়মিত বেরিয়েছে, এটা ভাবতেও আজ অবাক লাগে। যতটা মনে পড়ছে, পত্রিকাটি বের করা হয়েছিল ১৯৬১-তে। বেশ কিছুসংখ্যক নতুন লেখককে প্রতিষ্ঠিত করেছে *পূর্বমেঘ*। এ পত্রিকার জন্য লেখা সংগ্রহ, লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ, প্রাপ্ত ও নির্বাচিত লেখাগুলোকে পরিমার্জনায় জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মূল অবদান বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করে বলি, *পূর্বমেঘ*-কে অমন উচ্চতর মানে উন্নীত করেছিল সিদ্দিকী সাহেবের ভূমিকা। তাই জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও *পূর্বমেঘ* অবশ্য করেই অবিচ্ছেদ্য।

এইবার অবশেষে বলব জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের, বিশেষত জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর জীবনযাপনের কথা। এক কথায় বলতে গেলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগটিকে শুরুর থেকেই গড়ে তুলেছেন তিনি। অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা তো তাঁর ছিলই, এখন অতঃপর পেলেন সংগঠকের ভূমিকা। ইংরেজি বিভাগটিকে ষোলো আনা রূপদান, তা তাঁরই অবদান। কেবল শুধু বিশেষ একটি বিভাগইমাত্রই নয়, এক দুঃসময়ে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবেও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর ভূমিকা প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ইতিতে নিবেদন করি যে, সুহৃদ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর তিরোধানের পর তাঁর বিপুল কর্মযজ্ঞের মূল্যায়ন, যেমনটা সূচনাতেই বলা গেছে, এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সেটি যথার্থভাবে করা সম্ভব নয়। আমার, সমকালীন আমাদের অবলোকনে, স্মৃতিতে তিনি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

আজকের দিনে স্মৃতিচারণার এই অবকাশে সহযাত্রীবান্ধব জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর উদ্দেশে আমার হৃদয় নিংড়ানো যত শ্রদ্ধার, ভালোবাসার উৎসর্গ।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম
জাতীয় অধ্যাপক

[২১ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের *প্রথম আলো*-এ প্রকাশিত লেখার পুর্নমুদ্রণ]

কাইয়ুম চৌধুরী। আমাদের শিল্পকলার ভুবনে পরম শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় এক নাম। নিজের সৃজনশীলতার স্বাতন্ত্র্যে, প্রাচুর্যে ও বহুমুখিনতায় তিনি ছিলেন এক অক্লান্ত ও কর্মব্যস্ত শিল্পী। তাঁর চিত্রকর্মে, তা সে মানুষের প্রতিকৃতি হোক, আকাশের নীল হোক অথবা প্রকৃতির বৈচিত্র্য, সেখানে আবশ্যিকভাবেই আবিষ্কার করা যায় আমাদের স্বদেশকে। শিল্পকলায় মূর্ততার সঙ্গে বিমূর্তের এক সুদক্ষ মিতালী গড়ে তুলেছিলেন তিনি এক ঈর্ষণীয় স্বতঃস্ফূর্ততায়। প্রগতিবাদী যে কোন আন্দোলনে সমুখের কাতারে এসে দাঁড়াতেন দুঃসাহসিক পদবিক্ষেপে। আমাদের গ্রন্থ প্রকাশনা-শিল্পে প্রচ্ছদ অঙ্কন ও অলঙ্করণের মাধ্যমে তাতে নিখাদ আধুনিকতার ছোঁয়ায় মণ্ডিত করেছিলেন। বিগত ৩০ নভেম্বর, কোনরকমের বলা-কওয়া নেই, কিছু বোঝার আগেই তিনি চলে গেলেন একেবারে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমাদের অশ্রুধারা শুকাতে কত দীর্ঘ সময় লাগবে, সে-ও আমাদের অজানা।

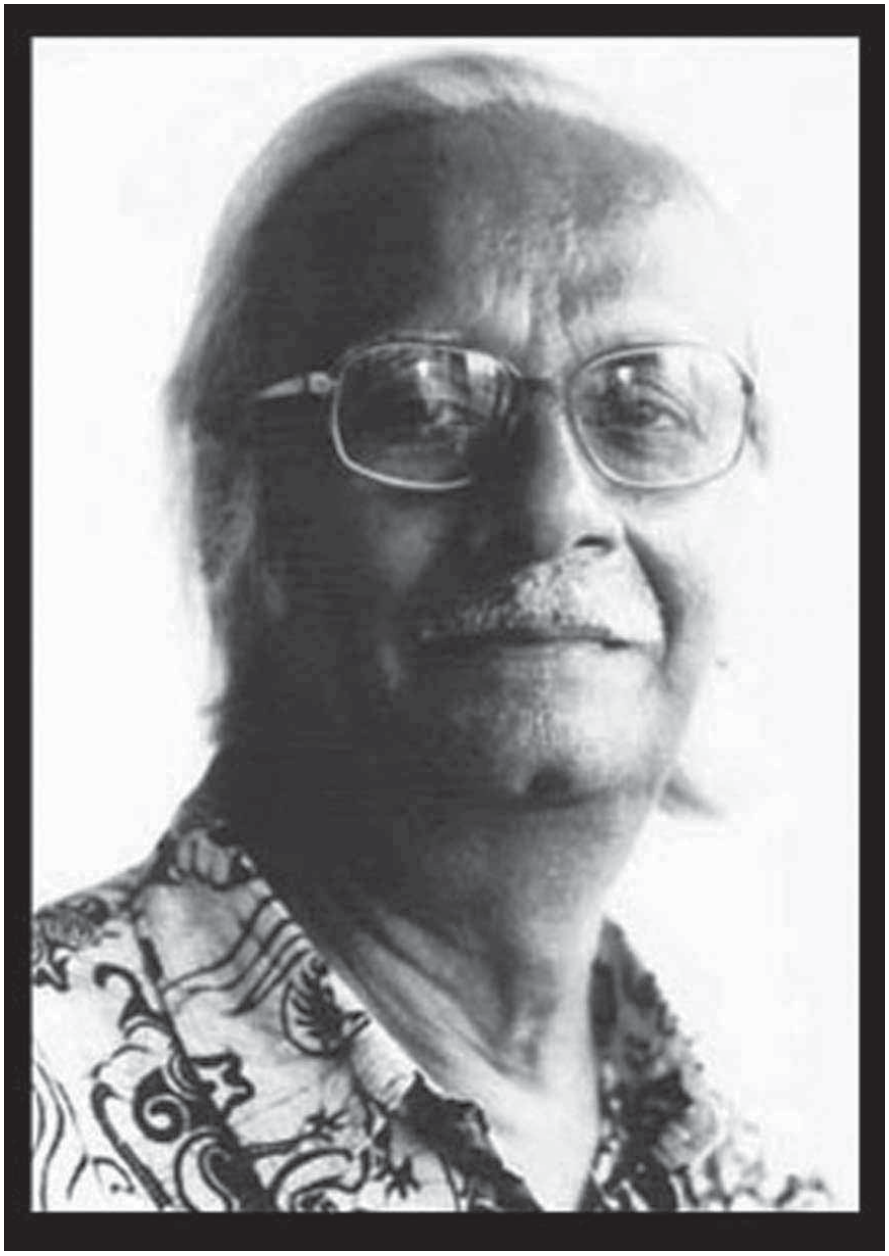

শ ফি আ হ মে দ

সান্ধ্য সমারোহে নিভে গেল দীপ

কাইয়ুম চৌধুরী, আমাদের অনেকের অত্যন্ত প্রিয়জন কাইয়ুম ভাই আর নেই। এই বাক্যটা একটা সত্য, এই তথ্য সঠিক, তা মানতে এখনো কষ্ট হচ্ছে, অন্তর্গতভাবে এই অনিবার্য বাস্তবতার প্রতিবাদ করছি, এখনো, তিনি চলে যাবার পক্ষাধিক কাল পরেও। হাজারো মানুষের সামনে, যারা নানাভাবে তাঁর আত্মীয় বা স্বজন এবং আরো বহু জন যাঁরা হয়তো তাঁকে তেমনভাবে চেনেন না, বোঝেন না ওই সাধারণদেহী মানুষটার মাপটা কত বড়, তাদের উদ্দেশে তিনি বেশ কিছু মনোযোগ-কাড়া কথা বলেছিলেন, এদেশে শিল্প আন্দোলনের শুরুর দিনগুলির কথা। আর সেই চমৎকার কথক বজ্রপাতের মত এক উড়ে আসা আঘাতে চিরতরে হারিয়ে গেলেন। ওই সন্ধ্যায় যাঁরা ওখানে ছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো অমন কথার স্রোতে ভাসতে চাননি, তাঁরা হয়ত একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। কারণ, সঙ্গীত পরিবেশনা কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছিল; কিন্তু কাইয়ুম ভাই তো ওই কথাই বলছিলেন যে, দেশের চারদিকে সোরগোল-তোলা নানা সংকটের মধ্যে বেঙ্গল ফাউণ্ডেশন নামের এই মহতী প্রতিষ্ঠানের হার-না-মানা সবল পৃষ্ঠপোষকতায় এখনো এমন উজ্জ্বল বিভাময় সাংস্কৃতিক উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হচ্ছে। তবু ওই আমার অনুমানের বৃত্তের স্বল্প ক'জনাও নিশ্চয়ই সুগভীরভাবে অনুতপ্ত ও পীড়িত বোধ করেছিলেন যখন জানলেন, উনি চলে গেছেন মহাপ্রস্থানের পথে।

অনেক দিন ধরে, হয়ত বা বয়সের কারণে, হয়ত বা আমার হৃদয়ে সঞ্চিত মানবিকতার ভাণ্ডারটা এখন শূন্যমুখী তাই, ব্যক্তিগত পরম শোকেও চোখের অশ্রু তেমন অবারিত হয়নি। কিন্তু কী আশ্চর্য! সেই আমি কাইয়ুম ভাই চলে যাবার খবর শুনে কেঁদেছি; শহীদ মিনারে বেশ কিছুক্ষণ ভাল ছিলাম; কিন্তু হঠাৎ করেই মন্টু ভাই বা মোস্তফা মনোয়ারকে দেখে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠলাম। বুকের ভেতর ছলাৎ চলাৎ শব্দ। যেন আরো কোন শোক সংবাদ ঘাপটি মেরে বসে আছে কোথাও। থেকে থেকেই চোখ মুছতে হয়েছিল সারাটি দিন, দিন পেরিয়ে কষ্টের ঘুম আসা অনেক রাত পর্যন্ত।

কাইয়ুম ভাইয়ের মৃত্যুর পর শোক ছাপিয়ে প্রায় সবাই মিলে একটা কথা বলাবলি করেছি। এ এক সুমহিম মৃত্যু। ঢাকার বিশাল সারস্বত সমাজ যেন এক জায়গায় সমবেত হয়েছে। তাঁদেরই একজন প্রধান কর্ণধার তো তিনি। সঙ্গীত ও শিল্পকে ভালোবাসে যে হাজারো মানুষ, এই দেশের অনাদি উদারবাদী সাংস্কৃতিক জমিনে সাম্প্রদায়িতার শকুনের মাঝে-মধ্যে ওড়াওড়িতে যাঁরা উদ্বেগে শিহরিত হয়ে ওঠেন, যারা এই দেশটাকে ভালবেসে দিয়ে গেল প্রাণ, তাদের সন্তান সন্ততিদের উপস্থিতিতে এমন শুদ্ধ ও সাংস্কৃতিক মহাসম্মেলনের মূল মঞ্চ থেকে ট্র্যাজিডির মহীরূহোপম মহানায়কের মত বিদায় নিলেন কাইয়ুম চৌধুরী। সম্রাটের জন্যও এমন ঈর্ষণীয় মৃত্যুর দৃষ্টান্ত তো তেমন মেলে না। অন্তরতর উদ্বেগ, গভীর প্রার্থনা, অশ্রু, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, আপনজন হারানোর বেদনার দিগন্তবিস্তারী কোরাসের ধ্বনি প্রতিধ্বনি, কাইয়ুম ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছিলেন না! আমাদের ভালোবাসার এমন কঠোর প্রমাণ নেবার তো কোন দরকার ছিল না আপনার।

কী সেই শেষ কথা ছিল আপনার? যা কিছু তার আগেই বলেছিলেন, তার পরম্পরায় হয়তো কিছু বলতেন আপনি। না কি অন্যতর কোন সুখ বা দুঃখের কোন স্বল্পদৈর্ঘ্য গল্প ভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন প্রিয়জনের সাথে? আমার এমনটা মনে হয়েছে, হয়ত বলতেন, গত বছরে যখন হিংসায় উন্মত্ত বাংলাদেশ, তখনও যে এমন সঙ্গীতায়োজন সম্ভবপর হয়েছিল, পেট্রল বোমা হাতে যমদূত হেথায় হেথায় শৃগালের মত লুকিয়েছিল, তবুও তো রুদ্ধ হয়ে যায়নি মানুষের ঢল। জানি না, হয়ত বা আপনি ভাঙতে চেয়েছিলেন শিল্প বা সঙ্গীতের কোন গভীর রহস্যময় শোলোক। ওই অব্যক্ত, না বলা, না শোনা কথার সম্ভাব্য সব রূপকল্পনা আমাদের মাঝে, আর তা আপনাকে যেন মহত্তর করে তুলেছে, কাইয়ুম ভাই।

সবারই মনে পড়ছিল, মানে বিশেষ করে আমরা যারা সেদিনের ওই সাঁঝ-পেরোনো, রাতের হামাগুড়ি দেয়া সন্ধ্যায় সাক্ষী ছিলাম, আমাদের আর এক মহান অগ্রজ শিল্পী কামরুল হাসানের চলে যাবার কাহিনী। এক মহান শিল্পীর মৃত্যু-ডাকের মৃদু শব্দে যেন কবিতা পরিষদের মঞ্চে যুগপৎ বেজেছিল সংগ্রামের উত্তাল ধ্বনি আর বিদায়ের বিষণ্ন বেহাগ। প্রায় আড়াই দশক সময় পেরোনো ওই সন্ধ্যার আলো-আঁধারি আমৃত্যু বিস্মৃত হব না আমরা। অনুষ্ঠান শেষ হয়নি, বিকেল থেকেই আছি, বাসায় ফিরে যেতে চাই, কামরুল ভাইকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যেতে পারি, সেকথা বলতে মঞ্চে উঠে

গেলাম, কামরুল ভাই বললেন, 'না তুমি যাও, আমার ভালো লাগছে, দেখি, আরো কিছুটা সময় থাকবো'। মাত্র ঘণ্টা দুয়েক পরে রামেন্দুদা ফোনে সেই উদ্বেগ ভারাক্রান্ত সংবাদ দিলেন। বাড়ির কাছাকাছি হৃদরোগ হাসপাতাল। দ্রুত ছুটলাম, আর কোনদিন তার সঙ্গে কথা হবে না, সেই সত্যটা সেই রাতের হালকা শীতটাকে বড় বেশি ভারী করে তুলল।

ঠিক কী ভাবে কাইয়ুম ভাইয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, তা আজ আর মনে পড়ছে না। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি ঢাকায় এসে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলাম। আজকের ঢাকার সঙ্গে তার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। না ট্রাফিক জ্যামের যানবদ্ধতায়, না প্রতি সন্ধ্যার বহুবাচনিক অনুষ্ঠানমালায়। গোধূলি বেলায় হাঁটতে হাঁটতে তখনকার আর্ট কলেজে একই প্রদর্শনী প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই দেখতে যেতাম। তখনই দেখা হয়েছিল, দেখা হত কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন্নবী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী এমন সব নামী শিল্পীদের সঙ্গে। দোতলার শিক্ষক লাউঞ্জে সন্ধ্যা নাগাদ আড্ডা চলত মাঝে মাঝে। অমন করেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। দিন দিন সেই সম্পর্ক ঘন হয়েছে।

আর্ট কলেজের সেই বিখ্যাত শুকনো পুকুর পেরিয়ে ওদিকটার যে ভবন তার দোতলায় কাইয়ুম ভাই, হাশেম ভাই, সমরদা পাশাপাশি বসতেন। বহুদিন ওখানটায় আড্ডা দিয়েছি। নানা কথাবার্তা থেকে কাইয়ুম ভাইয়ের দেশের প্রতি, মাটির প্রতি, সংস্কৃতির প্রগতি ঘরানার প্রতি টানটা বুঝতে পারতাম। অনেক দিনের অযুত আলাপ পেরিয়ে একটা রাজনৈতিক মন্তব্যের কথা মনে পড়ে। মাগুরার সেই চুনকালিমাখা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসছে। তখনো আওয়ামী লীগের কোন নেতাকে অমন উচ্চ কণ্ঠে বলতে শুনিনি, কিন্তু চা-সিঙাড়ার আড্ডায় কাইয়ুম ভাই বলেছিলেন, হয় এই মাগুরায় fair নির্বাচন হতে হবে, না হলে এখান থেকে খালেদা জিয়ার বিদায় ঘণ্টা বাজবে। ব্যাপারটা ঠিক তাই হয়েছিল। ওইরকম আড্ডার এক প্রহরে ছোটদের লেখাপড়া, শিখন, বইয়ের বিষয় এবং আঁকাআঁকি নিয়ে কথা উঠেছিল। কাইয়ুম ভাই বলেছিলেন, 'শফি, আপনি যদি সত্যি আপনার ভাবনামতো একটা বাচ্চাদের স্কুল খুলতে পারেন, আমি সপ্তায় একদিন সারদিন থেকে বিনা পয়সায় শিশুদের ড্রইং শিখিয়ে আসব'। জানতাম, তেমন হলে কাইয়ুম ভাই আঁকা ছাড়াও বাচ্চাদের আরো অনেককিছু শেখাতেন নিশ্চয়ই।

তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা নিয়মিত ছিল না; কিন্তু সম্পর্কের চরিত্রটা এমন যে, অনেকদিন যোগাযোগের অভাবেও তাতে মরচে ধরার কোন আশঙ্কা ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছ থেকে অনেক পেয়েছি, আদায় করে নিয়েছি। অন্যরা অনেকে যখন ক্ষান্তি দিয়েছে, তখন আমি লেগে থেকে ঠিকই আদায় করে নিয়েছি গ্রন্থের প্রচ্ছদ, কোন পোস্টারের ডিজাইন বা লোগো। ব্যক্তিগত কিছু কাজও করিয়ে নিয়েছি, তার নেপথ্যে ছিল শুধুই ভালোবাসা আর পারস্পরিক আস্থা। কত সব নিটোল স্মৃতি!

একটা ছোট বিষয় উল্লেখ করতে প্ররোচিত বোধ করছি। বিষয়টা লঘু। আজ যে শোকযাপনের আবহে এই শব্দগুলি উচ্চারণ করছি, তার সঙ্গে ঠিক যায় না। তখন জিয়াউর রহমানের কঠোর সামরিক শাসনের কাল। বাঙালিকে বাংলাদেশীতে পরিণত করার প্রবল তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ চলছে। কোথাও সভা করতে পারি না। জড়ো হতে পারি না। ওর মধ্যেই বঙ্গবন্ধু পরিষদ নামে একটা সংঘ তৈরি হল। এই কিছুকাল আগে প্রয়াত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক আমাদের গুরুজন মোশাররফ হোসেনের বাংলোয় বসে স্যার, সাংবাদিক বজলুর রহমান, হায়াৎ মামুদ আর আমি পরিকল্পনা করছি, একটা প্রকাশনা বার করব। রাত প্রায় দশটা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রহরীদের মধ্যে একজন বোধ হয় খবর দিল, গেটের আশেপাশে টিকটিকি ঘোরাফেরা করছে। বজলুর ভাইয়ের সাংবাদিক কার্ড আছে। তাঁর অত অসুবিধা হবার কথা নয়। তিনি চলে গেলেন। আমি আর হায়াৎ ওই রাতে স্যারের বাড়িতে থেকে গেলাম। ওই ছোট সংকলনটার নাম দিয়েছিলাম *বাংলার মাটি বাংলার জল*। কাইয়ুম ভাইয়ের কাছে ছুটে গেলাম প্রচ্ছদের জন্য। সেবার একদম দেরি করেননি। দু'দিনের মধ্যে দিয়ে দিলেন। দারুণ সুন্দর। অনাদি বাংলাদেশের নানা অনুষঙ্গের খেলা। একটু মোটা রেখায় আঁকা। ঠাট্টা করে কাইয়ুম ভাইকে বললাম, 'তাড়াতাড়িতে কামরুল ভাইয়ের থেকে মেরে দিলেন'। দারুণ প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন তিনি, 'মোটেও না কামরুল ভাইয়ের থেকে মারিনি, কামরুল ভাই আর আমি একই জায়গা থেকে মেরেছি'। আর সে জায়গাটা হল বাঙালির প্রাচীন ও গ্রামীণ বিবিধ শিল্প-মোটিফ।

কাইয়ুম ভাই, আপনি এখন আমাদের মাঝে নেই। এইটা একটা সত্য কথা, অসত্য কথা। আপনি আছেন, ব্যক্তি আপনি, অগ্রজ আপনি, শিল্পী কাইয়ুম, আমাদের ভাবনার সহচর কাইয়ুম। মুখ্য ও মহান আইরশ কবি ডব্লিই বি ইয়েটসের মৃত্যুতে আর এক বিখ্যাত কবি অডেন লিখেছিলেন, উন্মত্ত আয়ারল্যান্ড আপনাকে কবিতালিখনে বাধ্য করেছিল, লিখেছিলেন, কবিতা লিখে কিছু হয় না। কাইয়ুম ভাই এই দেশটা, তার প্রাকৃতিক বিচিত্রতা ও ঐশ্বর্য, তার পাখি, চাষী, আকাশ, নদী আর অকুলীন মানুষই তো আপনাকে প্ররোচিত করেছিল ছবি আঁকতে, মিছিলের সামনে দাঁড়াতে, অসংখ্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে। সেদিন আপনি একাই শহীদ মিনারে একটা ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বাক্-স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদে, ব্যানারে লিখেছিলেন 'একুশে টেলিভিশন দেখতে চাই', আমরা পরে আপনার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। শহীদ মিনারের আপনার নশ্বর দেহটাকে শেষবার দেখে ভাবছিলাম, এতসব আঁকাআঁকি যে করলেন, তা দিয়ে আমাদের কিছুই কি হবে না? তা থেকে কি আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদী, দেশাত্মবোধক ও উদারবাদী সাংস্কৃতিক বাণী চয়নের জন্য অজস্র ব্যানারের উজ্জ্বল শিখার বর্ণের উৎস খুঁজে পাব না? শিল্পীর দায়বদ্ধতার অমৃত কাঁটাগুলো কি অবিরত আমাদের বিঁধবে না?

শফি আহমেদ
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

শিক্ষা, একটি অব্যাহত সংলাপ

চল্লিশ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল শিক্ষকতার পর আমি অবসর গ্রহণ করেছি। এখনও গায়ে লেগে আছে শিক্ষকতার গন্ধ। বিগত বৎসরগুলিতে আমি দেশের কয়েকটি সংবাদপত্রে নিয়মিত লিখে আসছি। একজন কলাম- লেখককে অনেক বিচিত্র বিষয়ে লিখতে হয়। যখন যে বিষয় সংবাদ গুরুত্ব পায়, তখন সে বিষয়ে কলামিস্ট লিখবেন, এইটেই সাধারণ প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশা পূরণে আমিও বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আসছি। কিন্তু ঘুরেফিরে আমি শিক্ষা প্রসঙ্গেই লিখেছি সবচে' বেশি। তবে সঙ্গে সঙ্গে কবুল করব, আমার লেখায় উচ্চশিক্ষার প্রসঙ্গটা প্রাধান্য পেয়েছে, কারণ শিক্ষক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতাও বলা যায়, সীমাবদ্ধতা। আরও একটি কথা: শিক্ষার তাত্ত্বিক আলোচনায় আমার উৎসাহ বেশি নয়। এর প্রয়োগিক দিকটাই, বা অন্যভাবে বলা যায়, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যে চিন্তা, যে উপলব্ধি, তাকেই আমি মূলধন করে অগ্রসর হয়েছি। আজ, আপনাদের সামনে আমি কোনো ভাষণ দেব না। আমি যে কথাগুলো বলব, আমি চেষ্টা করব সেটাকে একটি আলাপ, একটি চিন্তার বিনিময়ে আমার অংশগ্রহণ, এই রূপে উপস্থাপিত করতে। আমি জানি, একটি সম্মেলনের পূর্বনির্ধারিত কাঠামোয় কোনো প্রকৃত সংলাপ বা চিন্তার বিনিময় সম্ভব নয়। তবে আমার কথাগুলি যখন আপনাদের অবসর মুহূর্তে আপনারা নেড়েচেড়ে দেখবেন, তখন আপনা থেকেই আপনাদের মনেও কিছু বক্তব্য জমা হবে। আপনারা সেগুলিকে উচ্চারণ না করলেও, বা কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ না করলেও, সেটা চিন্তার স্তরে, মানসিক প্রতিক্রিয়ার স্তরে, একটি সংলাপেরই রূপ গ্রহণ করবে।

অধ্যাপক সালাহ্উদ্দীন আহমদ-এর স্মরণে আয়োজিত শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। কে জানত আর মাত্র ১০ দিন পরে তিনিও আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।

সংলাপ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ থেকেই গড়ে উঠেছে ভাষা, এর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্য, এর মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে সমাজ ও কালক্রমে রাষ্ট্র। শিক্ষিত ও বিষয়ানুগ সংলাপের ভূমিকা ইতিহাসে সবার আগে ও সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করেছিল প্রাচীনকালের গ্রিকরা। ফলে তাদের হাতেই, তাদের মননের উর্বর জমিতেই, দর্শন, বিজ্ঞান ও বিচিত্র বিদ্যার আশ্চর্য ফসল ফলেছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার শিকড় সন্ধানে তাই ইতিহাসবিদ জানেন কোথায় যেতে হবে: প্রাচীন গ্রিসে। গ্রিসের চর্চায় যেহেতু সংলাপের ছিল মুখ্য ভূমিকা, তাই অবধারিতভাবে তারা বুঝে নিয়েছিল ভাষার গুরুত্ব। ভাষার লেখ্য ও কথ্য দুটি রূপই ছিল তাদের অনুশীলনীয় বিষয়। নিজেদের ভাষাকে তারা উৎকর্ষের চরম স্তরে নিয়ে গিয়েছিল; আর তারা যে জাতি হিসেবে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করত, সেটা তাদের অন্য কোনো দিকে শ্রেষ্ঠত্বের কারণে নয়, তাদের ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। অন্যেরা, যারা তাদের ভাষাকে তুলনীয় সৌকর্য, স্বচ্ছতা ও প্রকাশক্ষমতা দিতে পারে নি, গ্রীকদের দৃষ্টিতে তা ছিল বর্বর।

সকল শিক্ষার গোড়ায় ভাষার জায়গা সেজন্য চিরকাল সবাই, সবদেশে, সকল সমাজে, দিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে দ্বিতীয় যে বিষয়টিকে জায়গা দিতে হয়, সে হচ্ছে গণিত। গণিতকে বলা যায় শুদ্ধ চিন্তার ভাষা, যা বর্ণমালানির্ভর নয়, যা তৈরি করে নিয়েছে নিজস্ব বর্ণমালা। ইংরেজি প্রবাদের Three R's-reading, writing and 'rithmatic শিক্ষাতত্ত্বের এই মূল কথাটাই ঘোষণা করছে।

শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠন নিয়ে বিস্তর কথা, বিস্তর লেখালেখি ও কয়েক বৎসর অন্তর সরকারি উদ্যোগে একটি কমিটি বা কমিশন, আমরা সবাই এর পৌনঃপুনিকতার সাক্ষী। অতি সম্প্রতি একটি কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে, এখন সরকারের বিবেচনাধীন, আমরা শুনেছি। রিপোর্টের একটি কপি

আমার হস্তগত হয়েছে। যথাসময়ে ও যথাস্থানে আমি আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করব। তবে পূর্বাহ্নেই আমি এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখতে চাই।

আমার বিবেচনায় শিক্ষাসম্পর্কিত চিন্তার সূত্রপাত হবে শিক্ষাঙ্গনে, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা থেকে শুরু হয়ে, মাধ্যমিক শিক্ষার স্কুলের পথ ধরে, সবশেষে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রতিষ্ঠানে। অন্য কথায়, যেসব জায়গায় শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ এই মূল কাজটা চলছে, সেসব জায়গায় একটি নিরন্তর ধারায়, একটি অব্যাহত গতিতে, বয়ে চলেছে শিক্ষক ও ছাত্রের সংলাপের ধারা। শিক্ষা আমার দৃষ্টিতে এক ধরনের সংলাপ বই কিছু নয়, যে সংলাপের ধারাবাহিকতায় মনের পুষ্টি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হাত ধরাধরি করে চলে।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষা-পরিস্থিতি নিয়ে যত কথা শোনা যায়, তার মধ্যে একটি হলো, এ এক ঔপরিবেশিক ব্যবস্থা, ব্রিটিশের দেওয়া, এ আমাদের জন্য উপযোগী নয়, এ শিক্ষা আমাদের বিদেশী শাসকেরা প্রবর্তন করেছিল শুধু কেরানি সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। এটা কোনো মর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন জাতির উপযোগী শিক্ষা নয়, এটাকে ঢেলে সাজাতে হবে। বারংবার উচ্চারণে, বারংবার পুনরুক্তিতে, কথাগুলো পর্যবসিত হয়েছে আপ্তবাক্যে। আমাদের রাজনীতিকেরা অভ্যস্ত এইসব এবং আরও অনেক, আপ্তবাক্য উচ্চারণে। এই কথাগুলির মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছে সত্য, অর্ধসত্য ও অসত্যের। আমরা লক্ষ করছি, এমনকি বহু বিজ্ঞজনের সমন্বয়ে গঠিত কমিশন-কমিটিও তাদের সমন্বিত চিন্তাপ্রসূত রিপোর্টে শিক্ষাসম্পর্কিত বেশ কিছু আপ্তবাক্যই বলে চলেছেন। স্বাধীনতার পরবর্তী বৎসরগুলিতে একটি বহুল উচ্চারিত শব্দবন্ধ ছিল, গণমুখী শিক্ষা। ওই সময়ে কথাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল; একটি আদর্শ, একটি জাতীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছিল ওই শব্দক'টির মধ্য দিয়ে। সেই আদর্শ ও অভিপ্রায়কে ব্যঙ্গ করে, পরবর্তী বৎসরগুলিতে, সরকারি শিক্ষানীতি গণমানুষের স্বার্থের বিপরীতে কাজই করে চলেছে। সবচে' দুঃখের কথা, স্বৈরাচার আমলে গণবিরোধী ধারার সূত্রপাত হয়েছিল, যার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ড. মজিদ খানের মন্ত্রিত্বের সময়ে একটি ভ্রান্ত ও উদ্ভট শিক্ষানীতির মাধ্যমে, সেই ধারাটিই আরও পরিপুষ্ট হয়েছে স্বৈরাচার পতনের পর গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে। এ এক বিরস কৌতুকের বিষয় যে, কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্টে যেটুকু সমাজমুখী, কল্যাণমুখী ও গণমুখী প্রস্তাব ছিল, সর্বশেষ রিপোর্টে সেখান থেকে পশ্চাদপসরণের স্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি। একই দেশে সরকারি সহায়তায় দুইটি বিপরীত ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চলতে পারে না, কথাটা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারেনি এই কমিটি, যার নামকরণ হয়েছে শিক্ষা সংস্কার কমিটি। কমিটি সংস্কারের মূল বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণের স্পষ্ট আলোয় আনতে পারে নি। একটি ব্যর্থ, অপ্রয়োজনীয় আয়োজন, শুরু থেকেই একটি দীর্ঘমেয়াদি ইংরেজি ও ধর্মশিক্ষার আয়োজন, কী উদ্দেশ্যে ও কাদের স্বার্থে, তারা হয় বুঝতে পারে নি, বা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে। অপ্রয়োজনীয়, বা কম প্রয়োজনীয় বিষয়কে জায়গা দিতে গিয়ে প্রস্তাবিত নতুন কারিকুলামে জায়গা সঙ্কুচিত হয়েছে বহুকালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিষয়সমূহ।

রাজনীতির কৃষ্ণপক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব অনাচার হয়েছিল বলে এখন শুক্লপক্ষের নায়কেরা অনবরত প্রচার করে চলছেন, তার মধ্যে একটি হলো ইতিহাসের বিকৃতি। স্বৈরাচার আমলে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম থেকে ইতিহাস বিষয়টিই প্রকৃত প্রস্তাবে হয় উপেক্ষিত, নয়তো বর্জিত হয়েছিল। ইতিহাসের ওপর দ্বিতীয় খড়্গাঘাত হয়েছিল, ডিগ্রি ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে, ইতিহাসকে দ্বিখণ্ডিত করে। বিশেষ অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয় হিসেবে ইসলামের ইতিহাস প্রবর্তন করেছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। উচ্চতর শিক্ষায় এর প্রাসঙ্গিকতা ছিল। আর এই প্রবর্তনায় শিক্ষাবিদ স্যার আশুতোষের উদার চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল। কিন্তু স্কুল-কলেজের সাধারণ শিক্ষায় ইসলামের ইতিহাস, ইতিহাসের- নির্বিশেষ ইতিহাসের, বিকল্প হতে পারে না। কার্যত তা-ই হয়েছে। ডিগ্রি স্তরে ইতিহাসকে দিনে দিনে প্রায় স্থানচ্যুত করেছে জনপ্রিয়-যেহেতু সহজে পরিপাকযোগ্য এবং অল্পক্লেশে ফলদায়ী-ইসলামের ইতিহাস। যে ছাত্র কেবলই নোটবুক নির্ভর ইসলামের ইতিহাস পড়েছে, সে ইতিহাসের ছাত্র নয় ও সে ইতিহাস পড়েনি। এবং প্রকৃত ইতিহাস থেকে দূরে থাকা, ও ইসলামের ইতিহাস পাঠ করে ইতিহাসের পাঠগ্রহণকারী বলে দাবিদার ছাত্রদের সংখ্যাই অধিক। যিনি রাজনৈতিক কারণে ইতিহাস বিকৃতির নিন্দায় মুখর, তার ইতিহাস, আমার সন্দেহ, বিগত সিকি শতাব্দীর ওপারে যায় না। তার সমস্ত উদ্বেগ সমকালীন ইতিহাস নিয়ে, শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে ইতিহাসের কথা আমরা বলে থাকি, যা সাধারণ শিক্ষার একটি আবশ্যকীয় উপাদান, সেই ইতিহাস নিয়ে নয়। সাধারণ শিক্ষায় ইতিহাসকে একটি আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে পুনর্বাসিত করা, আমার বিবেচনায় আমাদের শিক্ষা-সংস্কার কর্মসূচির একটি জরুরি কাজ। যদি শিক্ষা-সংস্কার কমিটির রিপোর্টে এই জরুরি প্রসঙ্গগুলি যথোচিতভাবে উত্থাপিত ও আলোচিত না হয়ে থাকে, তা হলে সেটা আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।

শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা, এমন একটি বিষয়, যার বহুমাত্রিকতা বিষয়ে সম্যক ধারণা নিয়েই যে কোনো কমিটি বা কমিশনকে কাজ করতে হয়। কিন্তু আমরা পঞ্চাশের দশকের শরীফ কমিশন থেকে শুরু করে, সর্বশেষ শিক্ষা-সংস্কার কমিটির কাজ পর্যন্ত একটা পদ্ধতিগত ত্রুটি লক্ষ করে আসছি। কমিটি বা কমিশনের পর্যলোচনায় শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচিত হলেও শিক্ষার মূল কাজটি, যা শিক্ষকেরা করে চলেছেন স্কুলে-কলেজে- বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেই কাজটিকে নিবিড় পর্যালোচনায় আনার কোনো চেষ্টা দেখা যায় না। বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদানে, পাঠক্রম প্রণয়নের কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন শিক্ষকেরা, সেকথা তারাই ভালো

জানেন। শিক্ষায় অভিজ্ঞতা-নির্ভর সংস্কারচিন্তার কিছুটা অবকাশ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই স্তরে শিক্ষাক্রম তারাই তৈরি করেন, যারা শিক্ষকতা করেন। এই প্রয়োজনীয় যোগাযোগ থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সবসময় পরিবর্তনশীল, সচল ও সপ্রাণ। কিন্তু এর বাইরেই স্থবিরতা। কলেজ পর্যায়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকেরা তাদের কাজ করে থাকেন একটি আরোপিত কারিক্যুলামের ভিত্তিতে। অনেক সময় এই কারিক্যুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও যদি পরিষ্কার না হয়ে থাকে তাদের কাছে, তবে তাদের দোষ দেয়া যায় না। ওপর থেকে আরোপিত কারিক্যুলামের সঙ্গে কর্মরত শিক্ষকদের অন্তরঙ্গতা ঘটতে পারে না, যদি না তার জন্য একটা বিশেষ কর্মসূচি থাকে। আমি যতদূর জানি, সেরূপ কিছুই নেই। ফলে শিক্ষকতা প্রায়ই একটা প্রাণহীন, বিরস কর্মে পরিণত হয়। এর ওপর অধিকাংশ ছাত্র ও ছাত্রীর যদি লক্ষ্য হয় যে কোনো উপায়ে পরীক্ষায় পাশ করা, আর শিক্ষকেরাও যদি অবস্থার চাপে সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন, তা হলে সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাই একটি পর্বতপ্রমাণ প্রহসনে পরিণত হতে পারে। অনেকেই মনে করছেন, বাস্তবেও তা-ই হয়েছে। পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতির দায় বহন করতে হচ্ছে বিপুলসংখ্যক ছাত্রের সঙ্গে বিপুলসংখ্যক শিক্ষককে।

শিক্ষক ভাই ও বোনেদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে, আপনাদের সংগঠনের পাটাতনে দাঁড়িয়ে, এই সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করুন। আত্মসমীক্ষার যে সুযোগ আছে, যে জরুরি প্রয়োজন আছে, শিক্ষাচিন্তায় ও শিক্ষা-সংস্কারে আপনাদের অভিজ্ঞতাজাত সমালোচনায় যে অধিকার আপনাদের আছে সে অধিকার প্রয়োগ করুন। আপনাদের সম্মেলনে আপনাদের পেশাগত দাবিদাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের পেশার ভিত্তি শিক্ষাসংক্রান্ত গঠনমূলক পর্যালোচনার জায়গা করে দিন। প্রত্যেক সম্মেলনে সৃষ্টি করুন শিক্ষা পর্যালোচনার মুক্তচিন্তার আদান-প্রদানের, অভিজ্ঞতা বিনিময়ের, একটি প্রকৃত অ্যাকাডেমিক আবহ। আপনাদের সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের।

সরকারের কাছে শিক্ষক সমাজের দাবি অনেক, প্রত্যাশার সীমা-পরিসীমা নেই। আমাদের সব চাওয়ার লক্ষ্য ওই একটি দিকে- সরকারের দিকে। যদি সরকার বলতে আমরা রাজধানীর কেন্দ্রীয় সরকার বুঝে থাকি- এ যাবৎ আমরা তা-ই বুঝে আসছি-তা হলে আমাদের সকল আবেদন-নিবেদন অরণ্যে রোদন হবে। এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের বোঝা লাঘব করবার দিন এসেছে। আজকের চিন্তা, গণতান্ত্রিক চিন্তা, দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণের চিন্তা। বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে এই চিন্তা বাস্তব রূপ ধারণ করবে। নামসর্বস্ব স্থানীয় সরকার নয়, প্রকৃত দায়িত্বশীল ও আর্থিকভাবে ক্ষমতাশীল স্থানীয় সরকারই পারে স্থানীয়ভাবে শিক্ষার অধিকাংশ চাহিদা পূরণ করতে। অতীতে শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক ভূমিকা যা ছিল, তা-ও একসময়ে সঙ্কুচিত হয়ে আসে। এখন আবার সেই সামাজিক ভূমিকাকেই ভিন্ন কাঠামোয় ফিরিয়ে আনার চিন্তা শুরু হয়েছে। একটি স্কুলের বা কলেজের সকল সমস্যার সমাধান সরকারিকরণে নয়, এটা যত শীঘ্র আমরা অনুধাবন করব, ততই মঙ্গল। সহায়তার অনেক পথ আছে, সরকারিকরণ তার মধ্যে নিকৃষ্টতম পথ। আমাদের দেশে সরকারি কাজ যেভাবে আমলাতন্ত্রের লাল ফিতায় বাঁধা পড়ে আছে, এর ফলে সকল সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান অকেজো ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আত্মনির্ভরশীলতাই শিক্ষকতার পেশাকে দিতে পারে কাজের পুরস্কার, পেশার মর্যাদা। শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের বিরাট দায়িত্ব আছে। তবে সে দায়িত্ব পালনের রীতি ও পদ্ধতি হতে হবে একটি গণতান্ত্রিক সমাজের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। খুব শীঘ্র হয়তো রীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন হবে না। প্রথাবদ্ধ আমলাগোষ্ঠীই পরিবর্তনকে দুরূহ ও দুঃসাধ্য করবে। আমাদের কাজ হবে সরকারকে উদ্বুদ্ধ করা, যেন সরকারের সৃষ্টিশীল ও গণতান্ত্রিক উদ্যোগের বাস্তবায়নে তারা আমলাগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় সেবা ও সহযোগিতা পান।

জাতীয় শিক্ষা একটি সমগ্র ও অখণ্ড সত্তা। শিক্ষা খণ্ডিত হয়ে আছে একদিকে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়, অন্যদিকে সাধারণ ও মাদ্রাসাভিত্তিক দুই ধারায়। ও সবশেষে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-স্তরবিন্যাসে। ব্যবস্থাপনাগত, ধারাগত ও স্তরগত সকল বিভাজনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার সমগ্রতা ও অখণ্ডতাকে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের আমলে একটি দুরূহ অথচ জরুরি কাজ হয়ে পড়েছে। এই কাজে দেশের শিক্ষকসমাজের একটি বড় ভূমিকা থাকতে হবে। এজন্য তাদের নিরলসভাবে শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে একটি বিরতিহীন সংলাপ চালিয়ে যেতে হবে। দেশগড়ার দায়িত্ব শিক্ষক সমাজের, সমাজপতিরা কখনো ভুল করেন না কথাটা মনে করিয়ে দিতে, যদিও এই দায়িত্ব পালনের সহায়ক তাঁদের কর্তব্যপালনে অনেক বিচ্যুতি আছে। আপনাদের সংলাপ যেমন আপনাদের নিজেদের মধ্যে, তেমনি সমাজের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, রাজনীতিকেরা, তাঁদের সঙ্গেও হতে হবে। এই সংলাপের বিষয় শুধুই দাবিদাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এভাবে শিক্ষার উন্নয়নমূলক চিন্তার জন্ম দেবেন আপনারা এবং সেটা সঞ্চার করে দেবেন শাসক ও নিয়ন্ত্রকমহলে। আমাদের জাতীয় শিক্ষায় ব্যর্থতার দায় কেন আপনারাই এককভাবে বহন করবেন? সবাইকে বুঝতে দিন যে, ব্যর্থতার দায় তাদেরও। একক চেষ্টায় আপনারা পারবেন না শিক্ষার সমস্যা সমাধান করতে, এটাকে সমাজের সামগ্রিক চেষ্টায় পরিণত করতে হবে। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সংলাপের ধারা সৃষ্টি করাও হবে আপনাদের দায়িত্ব।

আপনাদের সম্মেলন সফল হোক, সার্থক হোক, সম্মেলন আপনাদের উজ্জীবিত করুক, অনুপ্রাণিত করুক, এই প্রার্থনা করি। শিক্ষা জাতিকে জাগ্রত করুক। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২৯ মার্চ ১৯৯৮, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, টাঙ্গাইল জেলা শাখার ৭ম ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ। (জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী রচিত *নির্বাচিত প্রবন্ধ* বই থেকে সংকলিত।)

সা লা হ্ উ দ্দী ন আহ্ ম দ

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ও মানবতাবাদ: কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ মানুষ। তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণীয় দিক ছিল যে, যাঁরা তাঁর মতামতের বিরোধী ছিলেন তাঁরাও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করতেন। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে, এমন একজন মানুষকেও হতে হলো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে পাকিস্তানি সামরিকতন্ত্রের নির্মম শিকার।

জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে আমার প্রথম ব্যক্তিগত পরিচয় হয় ১৯৪৭-এর শেষ দিকে; আমি তখন ঢাকায় এসে গেণ্ডারিয়ায় আমার এক আত্মীয়ের বাসায় থাকতাম। কলকাতায় থাকাকালীন জ্যোতির্ময়ের কথা জানতাম। ঢাকায় তখন প্রায়ই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতো। এখানকার সামাজিক জীবনের এটা ছিল মস্ত বড় অভিশাপ। সেই হিংসাত্মক পরিবেশে বাস করেও জ্যোতির্ময় নিজেকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেটা বোধহয় সম্ভব হয়েছিল তাঁর অসামান্য ব্যক্তিগত মানবিক গুণাবলি এবং এক মহৎ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার জন্য। জ্যোতির্ময় যে আদর্শে বিশ্বাস করতেন সেটা ছিল মানবতাবাদের আদর্শ।

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা

এই মানবতাবাদ নিছক ভাবাবেগের দ্বারা উদ্ভূত নয়; এটি ছিল ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও যুক্তিবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই মানবতাবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা ও চিন্তানায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায়। মানবেন্দ্রনাথ যাঁর আগের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যিনি প্রথম জীবনে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি ছদ্মবেশে এবং ছদ্মনামে দেশত্যাগ করে বিভিন্ন দেশ ঘুরে যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। রায়ের পরবর্তী জীবনবৃত্তান্ত মোটামুটি সবারই জানা। তিনি কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোতে গিয়ে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান সংগঠক হয়েছিলেন; ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর লেনিনের আমন্ত্রণে তিনি রাশিয়ায় যান এবং বেশ কয়েক বছর বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান সংস্থা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। কিন্তু লেনিনের মৃত্যুর পর নানাবিধ ঘটনাচক্রে তিনি শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ১৯৩০ সালে গোপনে ভারতে ফিরে আসার কিছুদিন পরই তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং এ দেশে কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে প্রায় সাত বছর কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মানবেন্দ্রনাথ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। এর মধ্যে তাঁর চিন্তাধারায় অনেক বিবর্তন ঘটেছে। রায় বুঝতে পেরেছিলেন যে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো গণতান্ত্রিক বা বৈপ্লবিক আন্দোলন করা সম্ভব নয়। `A revolutionary must be there where the masses are' -তিনি একথা প্রায়ই বলতেন। তাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিনি মনে করতেন যে কংগ্রেস ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভারতীয় জনগণের জাতীয় বা ন্যাশনাল প্লাটফর্ম, যদিও এর নেতৃত্ব ছিল রায়ের মতে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে। তাই রায় মনে করতেন যে, সব বিপ্লবীর উচিত কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্ব দখল করে নেয়া। তেমনি মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে গোঁড়া কমিউনিস্টদের বিরোধ লাগে এই কারণে যে, তিনি বাস্তবকে অস্বীকার করে কোনো আদর্শকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে রাজি হননি।

আমি মানবেন্দ্রনাথ রায়কে প্রথম দেখি ১৯৩৮ সালে। কলকাতার কিছু মুসলিম ছাত্রদের উদ্যোগে ওয়েলেসলি স্কোয়ারে অবস্থিত মুসলিম ইনস্টিটিউটে তিনি বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন:

সভানেত্রী ছিলেন বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ। মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায় তখন কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তাঁর একটি বই '*Historical Role of Islam*'-এর মাধ্যমে। এই বইটিতে রায় দেখিয়েছিলেন যে ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল সব রকম অসাম্য, অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে আরব সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করতে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষে প্রায় হাজার বছর ধরে পাশাপাশি বসবাস করা সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে খুব কমই জানে; তাই তাদের মধ্যে এতো ভুল বোঝাবুঝি যা অনেক সময় হিংসাত্মক হানাহানিতে পরিণত হয়। এর জন্য তিনি হিন্দুদেরই প্রধানত দায়ী করেছিলেন।

মানবেন্দ্রনাথ রায়

হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা ও নানা ধরনের কুসংস্কারকে রায় তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তাঁর এসব উক্তির জন্য মুসলমান সমাজে রায় একজন অসাম্প্রদায়িক জননেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। দীর্ঘ সুঠাম দেহের অধিকারী মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রথম দর্শনেই আমাদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। তার ওপর ছিল তাঁর অপূর্ব বাচনভঙ্গি এবং ইংরেজি ভাষার ওপর অসামান্য দখল। তাঁর বক্তব্য ছিল পরিষ্কার, যুক্তিপূর্ণ এবং তার মধ্যে কোনোরকম গোঁজামিল ছিল না। রায় তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, তিনি জানেন কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কিছু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লোক আছেন যারা মুসলমানদের সমস্যাগুলো সম্বন্ধে কিছু জানেন না বা জানতে চান না। এসব নেতার ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে হিন্দুত্বের সঙ্গে এক করে দেখার প্রবণতার ফলে মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহ ও হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাব জাগ্রত হয়েছে। মুসলমানদের আহ্বান জানিয়ে রায় বললেন, তারা যদি অধিক সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দেয় তাহলে কংগ্রেসে এক নতুন অসাম্প্রদায়িক এবং প্রগতিশীল নেতৃত্বের আবির্ভাব হতে পারে। রায় মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের এই প্রচেষ্টার পাশে থাকবেন।

বস্তুত তখন থেকেই আমার মতো কিছু যুবক রায়ের অনুসারী হয়ে যায়। এই সময় আমরা সাম্যবাদের প্রতিও ঝুঁকে পড়েছিলাম এবং কমিউনিস্ট বইপত্র পড়তে শুরু করেছিলাম। কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তখন বেআইনি এবং কমিউনিস্ট পুস্তক-পুস্তিকা রাখা নিষিদ্ধ ছিল; তবুও গোপনে এগুলো জোগাড় করতে আমাদের অসুবিধা হয়নি। ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসে অনার্স পড়ার সময় জহুর হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁরই উদ্যোগে আমরা দু'জনে রায়ের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ি। রায় আমাদের শিখিয়েছিলেন যে, সব রকম অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে পরিহার করে মুক্ত মানুষ হতে। তিনি প্রায়ই বলতেন, মুক্ত মানুষ না হলে মুক্ত সমাজ গঠন করা যায় না। তিনি মনে করতেন যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত নীতিজ্ঞান ও সৃজনশীল প্রতিভা রয়েছে সেটা তাকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে পারে। যে কোনো ধরনের অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামি ধর্মীয় বা রাজনৈতিক-মানুষের জয়যাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই ধরনের মুক্তচিন্তার ধারক ছিলেন বলেই বোধহয় রায় কোনো দলীয় শৃঙ্খলার বেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে বেশিদিন আবদ্ধ রাখতে পারেননি। তিনি জনপ্রিয় নেতা ছিলেন এ কথাও বলা যায় না। জনপ্রিয় কুসংস্কার, জনপ্রিয় অন্ধবিশ্বাস, জনপ্রিয় অনগ্রসরতাকে সমর্থন ও অবলম্বন করে অতি সহজেই জনপ্রিয় হওয়া যায়; কিন্তু রায়ের এ ধরনের জনপ্রিয়তা কাম্য ছিল না।

মানবেন্দ্রনাথ সারাজীবন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় তখন রায় সবাইকে অবাক করে দিয়ে ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে পশ্চিমী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক শক্তিবর্গকে সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানালেন। তাঁর যুক্তি হলো, প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ; সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্তর্দ্বন্দ্ব। কিন্তু ১৯৩৯ সালে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলো তার চরিত্র ছিল অন্য রকম। আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ বিশ্বের সমগ্র গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধনতান্ত্রিক শক্তিদের অন্তর্নিহিত বিরোধ ও স্ববিরোধিতার ফলে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে যদি ফ্যাসিবাদী শক্তি জয়লাভ করতো, তাহলে সেটা সারা বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণের জন্য একটা বিরাট বিপর্যয় ডেকে আনত। রায় অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, নাৎসি জার্মানীর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হলো সারা বিশ্বের নিপীড়িত ও মুক্তিকামী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সোভিয়েত ইউনিয়ন। ইতোপূর্বে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে (১৯৩৫) দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের মহড়া একবার হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনে দুই পক্ষই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থেকেছে। শুধু তাই নয়, কুখ্যাত মিউনিখ চুক্তির (১৯৩৮) পরে ১৯৩৯

সালে জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তিও সই করা হয়েছিল। উভয় পক্ষেরই ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। পরস্পরবিরোধী শক্তিদের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থ রক্ষার জন্যও এ ধরণের সামরিক চুক্তিতে উপনীত হওয়া ইতিহাসের কোনো বিচিত্র ঘটনা নয়।

মানবেন্দ্রনাথের যুক্তি ছিল যে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শক্তিবর্গকে সমর্থন করার মাধ্যমে ভারতীয় জনগণ স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ সরকারের ওপর অধিকতর চাপ সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে। কিন্তু নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গ যদি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জয়লাভ করে তা হলে সোভিয়েত ইউয়িনসহ সারা বিশ্বের জন্য সেটা হবে মারাত্মক অভিশাপ। এ অবস্থায় রায়ের ভাষায়, 'India cannot remain free in an enslaved world' অর্থাৎ সারা বিশ্বে যদি ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ভারতও স্বাধীন থাকতে পারে না।

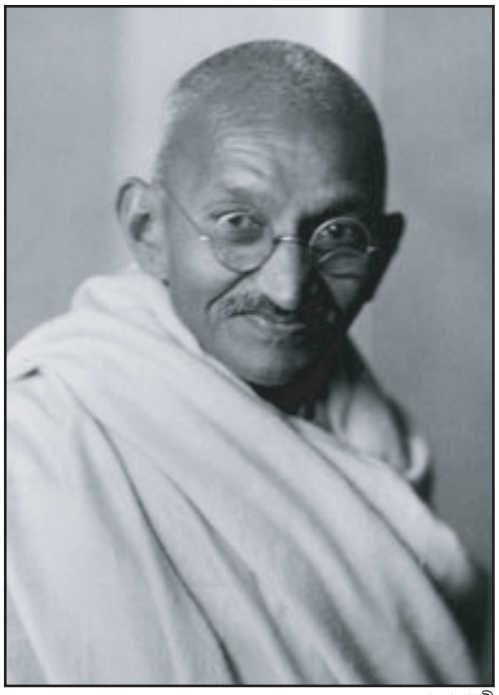
মহাত্মা গান্ধী

যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী মহল এবং কংগ্রেস রায়কে সাম্রাজ্যবাদের 'দালাল' হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর সমালোচনা করেছিল। কিন্তু রায় সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। ভারতের কমিউনিস্টরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে প্রথমে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করে এর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু ১৯৪১ সালের জুন মাসে যখন হঠাৎ করে জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর মারাত্মকভাবে আঘাত হানল–সেই মুহূর্তে কমিউনিস্টরা এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সর্বাত্মক ঘোষণা করলো। নীতির ক্ষেত্রে এই ডিগবাজির জন্য কমিউনিস্টদের বেশ কিছুদিন অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

মানবেন্দ্রনাথ রায় বিশ্বাস করতেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিট্রিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ভারতের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা বেশিদিন সম্ভব হবে না এবং ভারত অচিরেই স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হবে, তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্যভাবে সফল হয়েছিল।

তবে রায়ের সব কথা আমি নির্বিচারে মেনে নিয়েছিলাম এটা ঠিক নয়। বিশেষ করে গান্ধীজী ও নেহরু সম্পর্কে রায় যেসব ঢালাও বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন আমার কাছে তা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আমি রেডক্রস-কর্মী হিসেবে নোয়াখালীতে কিছুদিন ছিলাম। সে সময় গান্ধীজিও নোয়াখালীতে ছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত পদযাত্রার মাধ্যমে দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের জন্য আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনে এবং তাঁর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার মনে হয়েছিল যে, গান্ধীজিও তো একজন মানবতাবাদী, যদিও তাঁর মানবতাবাদ ছিল ধর্মভিত্তিক। ধর্মে বিশ্বাসী না হয়েও তাঁর প্রার্থনা সঙ্গীত আমাকে অভিভূত করেছিল। হিন্দু ও মুসলমান যখন ধর্মের নামে পরস্পরকে হত্যা করছিল সে সময় 'ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরি নাম, সাব্‌কো সদমতি দে ভগবান'। এই বাণী যিনি অন্তর দিয়ে উচ্চারণ করেন, তাঁর মহত্ত্বকে কে অস্বীকার করবে? তারপর থেকে গান্ধীজীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেকখানি বেড়ে যায়। পরে যখন একজন হিন্দু আততায়ীর হাতে গান্ধীজী মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর সেই মহান আত্মত্যাগ গান্ধীজী-বিরোধী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মনকেও নাড়া দেয় এবং তিনি তাঁর পত্রিকা *Independent India*-তে মহাত্মা গান্ধীকে যিশু খ্রিস্ট্রের সঙ্গে তুলনা করে আবেগময় ভাষায় সম্পাদকীয় লিখেছিলেন।

তেমনি নেহরু সম্পর্কেও রায়ের সমালোচনা আমি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারিনি। নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আমাকে তাঁর প্রতি আকর্ষণ করে। আমার মনে হয়, পরবর্তী কালে নেহরু সম্বন্ধেও রায় কিছুটা মত পরিবর্তন করেছিলেন। দেরাদুনে রায় যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন প্রধানমন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহরু তাঁকে দেখতে যান এবং পুরনো বিরোধের অবসান হয়।

পাকিস্তান অন্দোলনের প্রতি রায়ের সমর্থনও আমার মনোপূত ছিল না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, পাকিস্তান কখনোই মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ আনতে পারবে না। কায়েমি স্বার্থ মুসলিম সমাজে ধর্মের জিগির তুলে মুসলমান জনসাধারণকে ভুল পথে চালিত করছে। ধর্মান্ধতাকে সবসময় প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে শোষণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। রায় তো নিজেই আমাদের শিখিয়েছিলেন যে,

জনপ্রিয়তা ও প্রগতি সবসময় এক জিনিস নাও হতে পারে। অনুন্নত সমাজে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়, কিন্তু কোনমতেই প্রগতিশীল নয় বরং প্রতিক্রিয়াশীল। তাই ভারতের মুলমানরা ধর্মীয় আবেগে উন্মত্ত হয়ে যখন 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ধ্বনি তুলছিল, তখন তাকে সমর্থন করার পেছনে কোন যুক্তি ছিল না।

বস্তুত, পাকিস্তান আন্দোলনকে আমার কাছে অনৈতিহাসিক, অযৌক্তিক, অবাস্তব এবং ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছিল। আজ পাকিস্তানের দিকে তাকালে এবং ভারতের মুসলমানদের অবস্থার কথা চিন্তা করলে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়।

যা হোক, সমাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে তো থাকা যায় না। সমাজে যদি পরিবর্তন আনতে হয়, তাহলে সমাজের মধ্যে থেকেই সেটা আনার চেষ্টা করতে হবে। তাই পাকিস্তান হওয়ার পর আমিও ঢাকা চলে এলাম। কলকাতা থাকতেই জেনেছিলাম ঢাকায় যে কয়জন আমাদের পার্টির সদস্য আছেন তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হলেন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। তিনি তখন জগন্নাথ কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক। ঢাকায় এসে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমার অসুবিধা হয়নি। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমার আপনজন হয়ে গেলেন।

আমি তখন বেকার; গেণ্ডারিয়া অঞ্চলে আমার এক চাচার বাসায় থাকি। জ্যোতির্ময় আমার জন্য চাকরির চেষ্টা করতে লাগলেন এবং আমার ঢাকা আসার কয়েক মাস পর তাঁরই উৎসাহে এবং উদ্যোগে আমি জগন্নাথ কলেজে ইতিহাসের লেকচারারের পদে যোগদান করি। আমার শিক্ষকতা জীবনের শুরু হলো এভাবে। জ্যোতির্ময় আমাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন এই পথে।

কিছুদিন পর জ্যোতির্ময় জগন্নাথ কলেজের চাকরি ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে যোগ দেন। এর মধ্যে তিনি বিয়ে করলেন বাসন্তী দেবীকে। বাসন্তী তখন গেণ্ডারিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। বাসন্তী হয়েছিলেন জ্যোতির্ময়ের যোগ্য সহধর্মিণী ও জীবন-সাথী। তাঁরা দু'জনে ছিলেন একটি আদর্শ জুড়ি। এরপর কয়েক দশক অতিবাহিত হয়েছে। ১৯৫০ সালে ঢাকায় যে মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, তার ফলে বহু হিন্দু দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহু হিন্দু শিক্ষক ভারতে চলে যান এবং এর ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বিরাট সঙ্কট দেখা দেয়। কিন্তু জ্যোতির্ময় ও বাসন্তী নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও দেশত্যাগ করার কল্পনা কখনো করতে পারেননি।

জ্যোতির্ময় থাকতেন গেণ্ডারিয়ার স্কুলের বাসায়। তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন একমাত্র কন্যা সন্তান দোলাকে (মেঘনা গুহঠাকুরতা, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রফেসর) নিয়ে খুব সুন্দরভাবে কাটছিল। মাঝে মধ্যে বন্ধু-বান্ধবরা তাদের বাসায় গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করেছি, আড্ডা দিয়েছি এবং বাসন্তীর হাতের চমৎকার রান্না খেয়েছি। এর মধ্যে জ্যোতির্ময় ও বাসন্তী উভয়ই বিলেতে গেছেন উচ্চশিক্ষার জন্য। জ্যোতির্ময় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে পি.এইচ.ডি এবং বাসন্তী ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে এসেছেন। ইচ্ছে করলে এঁরা দু'জনেই পৃথিবীর যে কোনো স্থানে ভালো চাকরি পেয়ে চলে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা দেশে ফিরে এলেন। এটা এতো দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, অজ্ঞাত কারণে দেশে ফেরার পরই পাকিস্তান সরকার জ্যোতির্ময়ের আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করলো। ফলে জ্যোতির্ময় তাঁর অসুস্থ মা ও ভাইবোনদের দেখতে কলকাতায় যেতে পারেননি।

আমার যত দূর মনে পড়ে, ১৯৭০ সালে জ্যোতির্ময়কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের পদে নিযুক্ত করা হয়। তদানীন্তন উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী যিনি এককালে ছাত্রজীবনে জ্যোতির্ময়ের সহপাঠী ছিলেন, তাঁর অনুরোধেই জ্যোতির্ময় ঐ পদ নিতে রাজি হয়েছিলেন। এরপর জ্যোতির্ময়রা গেণ্ডারিয়ার স্কুলের বাসা ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শহীদ মিনারের উল্টো দিকে একটি বড় ফ্ল্যাটে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৫৪ সালে আমি ঢাকা ছেড়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে চলে যাই। তবে ঢাকায় আমাকে প্রায় আসতে হতো এবং সময় পেলেই জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে দেখা করতাম। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ প্রায় পুরো সময়টা আমি ঢাকায় ছিলাম। ঐ সময় জ্যোতির্ময়রা প্রায়ই আমাদের বাসায় আসতেন। জ্যোতির্ময় আমাদের প্রায়ই বলতেন যে, তিনি প্রভোস্টের পদ ছেড়ে দিয়ে গেণ্ডারিরয়ায় গিয়ে বাসন্তীর স্কুলের কোয়ার্টারে থাকতে চান, কারণ বাসন্তীর জন্য রোজ গেণ্ডারিয়া থেকে যাতায়াত করা খুব কষ্টকর ছিল।

তারপর এলো সেই ভয়াল ২৫ মার্চ রাত। মহাপ্রাণ জ্যোতির্ময় পাকবাহিনীর চরম নৃশংসতার শিকার হলেন। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ছিলেন একজন আদর্শ মানবতাবাদী। তাঁর মধ্যে ছিল অটুট ও অফুরন্ত আশাবাদ। কোনো অবস্থায় মানুষের ওপর বিশ্বাস তিনি হারাননি। গুলির আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে যখন তিনি মৃত্যুপথযাত্রী, তখনো তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যে উন্মত্ত হিংসা ও বিদ্বেষের শিকার তিনি নিজে হয়েছেন, সে হিংসা ও বিদ্বেষ একদিন দূর হবে; মানুষ তার সুজনশীল প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে এক নতুন সুন্দরতর পৃথিবী সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

[সালাহ্উদ্দীন আহমদ রচিত *বরণীয় ব্যক্তিত্ব স্মরণীয় সুহৃদ গ্রন্থ* থেকে সংকলিত]

মো. মাহমুদ হাসান রাসেল

মানুষের জন্য নির্মিত সমাজ ও সমাজ কাঠামো: বর্তমান প্রেক্ষাপট

এদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে অনেক প্রচেষ্টা চলছে, কিছু সরকারি প্রচেষ্টা এবং অনেক বেসরকারি, মূলত এনজিও প্রচেষ্টা। এ সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু দারিদ্র্য বিমোচন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে অবশ্যই; এ ধরনের প্রচেষ্টার দুইটা প্রধান সমস্যার কথা উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, এ ধরনের প্রচেষ্টা বাইরের বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরিচালিত হয় বলে এগুলোর ওভারহেড খরচ অত্যন্ত বেশি। এই সব সংস্থার খরচ যোগানো হয় মূলত বিদেশি সাহায্য দিয়ে। সেজন্য দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, যাদের উপকারের জন্য এ সমস্ত প্রকল্প নেয়া হচ্ছে তাদের কাছে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের কোন জবাবদিহিতা নেই, যার ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সম্পর্কটা পেট্রণ-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের মতো, যা তাদের সত্যিকার ক্ষমতায়নের পথে অন্তরায়। একথা বোধ হয় বলা যায় যে, যেসব এনজিও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের দরিদ্র আখ্যা দিয়ে তাদের টার্গেট করে- যে ধরনের ভীষণ আপত্তিকর ভাষা অনেক এনজিও-দের মধ্যেই চলতে দেখা যায়- তারা এই মানুষদের আত্মশক্তিকে যেন হত্যা করে। সুবিধাবঞ্চিত মানুষরা তাদের জীবনের অগ্রগতির জন্য পরনির্ভরশীলই থেকে যায়, এবং তাদের উপকার করবার জন্য একটি চাকুরিজীবী এলিট শ্রেণী বিকশিত হতে থাকে। দেশের সার্বিক ভাবমূর্তিও এই কারণে নেতিবাচক থেকে যায়- যেন এদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বাইরে থেকে সাহায্য নিয়ে যেতেই হবে। কথাগুলো অধ্যাপক আনিসুর রহমান তার জনগণের নিজস্ব উদ্যোগ থেকে 'দারিদ্র্য ও উন্নয়ন সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি' শিরোনামের লেখাটিতে বলেছিলেন।

চলমান উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার কারণ তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন। এখানে একটি সত্য প্রতীয়মান যে, চলমান উন্নয়ন প্রচেষ্টায় গণমানুষের অংশগ্রহণ নেই।

যদিও আমরা জানি মানুষ সৃজনশীল প্রাণী। সৃজনশীল প্রাণী বলেই মানুষ অন্য প্রাণী থেকে আলাদা হতে পেরেছে। অনুশীলন করে করে মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্যকে আরো শাণিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এই সামর্থ্য সকল মানুষেরই সমান। কম বেশি হয় অনুশীলনের তারতম্যে। মানুষকে শিখতে হয় অনুশীলন করে। সে কারণেই মানুষ অন্যকে শেখাতে পারে না। এটা অসম্ভব। মানুষ কেবল শেখার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতে সক্ষম। যারা গণগবেষণা করেন মানুষ সম্পর্কে এমন উঁচু ধারণা নিয়েই পরিবর্তনের জন্য তারা এগোতে শুরু করেন।

কেবল বিশ্বাস নয়, গণগবেষকগণ অগ্রসর হন যুক্তির পথে। যার ফলে সহায়ক এবং গণগবেষকগণ খুঁজে বের করেছেন যে, প্রচলিত উন্নয়ন সূচক একটি ভ্রান্ত ধারণার ওপর তৈরি হয়েছে। এর জন্য তাদের কোন পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রকাশিত বই পড়তে হয়নি। বিশেষজ্ঞের জ্ঞানও ধার করতে হয়নি। কেবল দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনবরত চিন্তা, প্রশ্ন, বিতর্ক আর অবিরাম উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়ে এসব সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাঁরা।

সকল বিষয়ই এসেছে সমাজ এবং তার চারপাশকে কেন্দ্র করে। তাহলে সমাজকে তারা কিভাবে চিনেছে। আমাদের কাছে সমাজের স্বরূপটা কী? আমরা জানি, সমাজ স্বার্থের ঐক্য তৈরি করে। আর সমাজ তৈরি হয় সম্মান, স্বার্থ এবং মর্যাদার প্রশ্নে। ফলে প্রয়োজন, উদ্দেশ্য এবং স্বার্থকে কেন্দ্র করে কিছু মানুষ দলবদ্ধ বা একত্রিত হয়ে বসবাস করলে তাকে আমরা সমাজ বলে স্বীকৃতি দিতে পারি।

এই সমাজে রয়েছে সুনির্দিষ্ট শ্রেণীকাঠামো। শ্রেণীকাঠামোই ঠিক করে দেয় মানুষের ক্ষমতা, আত্মমর্যাদা এবং সামাজিক মর্যাদার বিষয়। সমাজে বসবাসরত মানুষ ক্ষমতাকে বিভিন্নভাবে চেনে। ক্ষমতাকে মানুষের বিভিন্ন সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশকে বলা যেতে পারে। যেমন একজন মানুষের যদি অর্থ বেশী থাকে তবে ক্ষমতার প্রভাব নির্ভর করে অর্থের পরিমাণের ওপর। যে মানুষটির প্রচুর সম্পদ রয়েছে তার সেই সম্পদই ঠিক করে দেয় তার ক্ষমতার মাপকাঠি। এর পাশাপাশি একজন মানুষের পেশীর ক্ষমতা, সংগঠনের ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতাও থাকতে পারে।

আমরা দেখেছি সমাজে যার ক্ষমতা বেশী তার সামাজিক মর্যাদাও বেশী এবং আত্মমর্যাদা কম বা বেশী হতে পারে। এই ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা সমাজের উঁচু শ্রেণীর হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের সামাজিক মর্যাদা তুলনামূলকভাবে কম এবং নিম্নবিত্তদের আরও কম বা ক্ষেত্র বিশেষে নাও থাকতে পারে। এছাড়া অন্যান্য যে সকল গুণ থাকার কারণে মানুষ সামাজিক মর্যাদা পেয়ে থাকে সেগুলো হলো: ● শিক্ষা (উচ্চশিক্ষা) ● ন্যায়পরায়ণতা ● বংশগত

মর্যাদা ● পদমর্যাদা ● পেশা ● সৎসাহস/প্রতিবাদী কণ্ঠ ● দান-খয়রাত ● বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান ● পেশীশক্তি ● আমানত-এর খেয়ানত না করা ● সত্যবাদিতা ● প্রতিশ্রুতি রক্ষা ● সাংগঠনিক শক্তি ● স্বশিক্ষা ● বিশেষ দক্ষতা বা গুণ।

শিক্ষা বলতে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেই বুঝে থাকি। কারণ, বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চ শিক্ষিত লোকজন সমাজের অন্যদের কাছ থেকে মর্যাদা পায়। বিশেষ করে নিরক্ষর মানুষদের কাছ থেকে। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা সমাজে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আলাদা করে মর্যাদা পাবার সুযোগ করে দেয়। তবে যার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই তিনি মর্যাদাবান হয়ে ওঠেন কিছু বিশেষ গুণ অর্জনের মাধ্যমে। তাদের মধ্যে অনেকের এমন কিছু গুণাবলী বা দক্ষতা আছে যা সরাসরি অবদানের পর্যায়ে পড়ে না। তবে সমাজ এজন্য তাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকে। এই কারণে তিনটি বিষয়কে আলাদা করে দেখা যেতে পারে উচ্চশিক্ষা, স্বশিক্ষা এবং দক্ষতা।

শিক্ষার পাশাপাশি ক্ষমতাও মানুষকে মর্যাদা পাবার সুযোগ করে দেয়। অর্থাৎ ক্ষমতাও মানুষের একটি গুণ। মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণের কারণে সে প্রকৃত ও স্থায়ী মর্যাদার অধিকারী হয়। কিন্তু অর্থ ক্ষমতা নিয়ে যে মর্যাদা হয়, তা স্থায়ী নয়।

মর্যাদা কি তবে অস্থায়ী? সমাজে মর্যাদা দুইভাবে অবস্থান করে। এগুলো হলো দৃশ্যমান অবস্থা এবং অদৃশ্য অবস্থা। সমাজে যার দৃশ্যমান ক্ষমতা বেশী, সে তত বেশী দৃশ্যমান মর্যাদা ভোগ করে। শক্তি ও বস্তু দুটি ভিন্ন বিষয়। শক্তির ঘনীভূত রূপ বস্তু। মানুষ বস্তুর মাধ্যমে শক্তি কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা এবং মর্যাদা অর্জন করছে। এই ক্ষমতা এবং মর্যাদার মাঝে একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

ক্ষমতা সমাজে বিভিন্নভাবে পরিচিত: ক্ষমতা হচ্ছে

১. নিজেকে এবং অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করা
২. কোন কিছু করার সামর্থ্য
৩. কোন অঞ্চল বা সম্পদ দখল করার বা নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা
৪. বৈধ ও অবৈধ সামর্থ্য
৫. নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা এবং কৌশল
৬. আধিপত্য বিস্তার করা
৭. নেতৃত্বের সঠিক বা বেঠিক প্রয়োগ
৮. নিজের এবং অন্যের সহযোগিতায় অর্জিত শক্তি
৯. আধিপতর রূপ

ক্ষমতা কাঠামোয় ক্ষমতাসীন ব্যক্তির প্রভাবে অন্যেরা প্রভাবিত হয়। ক্ষমতা এবং মর্যাদা দুটো আলাদা বিষয়। ক্ষমতার ক্ষেত্রে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি প্রকাশ পায়। ক্ষমতাবান ব্যক্তি তার ক্ষমতার উৎস তথা ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। শুধু মানুষকেই নয় গোটা সমাজকে সে নিয়ন্ত্রণ করে বা করতে চায়।

ক্ষমতার উৎসগুলো হলো: ● আর্থিক সচ্ছলতা ● দক্ষতা ● জনসমর্থন ● উচ্চপদস্থ আত্মীয় ● রাজনৈতিক সমর্থন ● একতা ● তথ্য–উপাত্ত ● জ্ঞান ● তত্ত্ব ● শিক্ষা ● কৌশল ● পেশিশক্তি ● দৃঢ় মনোবল ● প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক ● কর্তৃত্বপূর্ণ পদ ● সম্পদ।

এই গুণগুলোর অধিকারী মানুষ ক্ষমতাবান। ফলে তারা সামাজিকভাবে মর্যাদা পেয়ে থাকেন। মর্যাদা ক্ষেত্রবিশেষে বাহ্যিক বিভিন্ন বিষয় প্রভাবিত হয়। অপরপক্ষে, আত্মমর্যাদার বিষয়টি একেবারেই মানুষের ভিতরের শক্তি, তাগিদ ও প্রেরণার ফসল। আত্মমর্যাদা যার বেশী সামাজিক মর্যাদা সে বেশী পায়। অন্যদিকে মর্যাদা বেশী থাকলেও অনেক সময় আত্মমর্যাদা বেশী নাও থাকতে পারে।

কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে তাদের মানবীয় গুণাবলীর সর্বোচ্চ বিকাশ হয়ে থাকে। মানবীয় গুণাবলীর সর্বোচ্চ বিকাশ যার মধ্যে ঘটে, সেও এক প্রকার শক্তির অধিকারী হয়। আমাদের সমাজে মর্যাদার বিষয়টি ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। ক্ষমতা যার বেশী, মর্যাদা তার বেশী। যার ক্ষমতা এবং মর্যাদা দুটোই বেশী তার আত্মমর্যাদা আরো বেশী হতে পারে। একজন মানুষের মর্যাদা এবং ক্ষমতা দুটোই বেশী কিন্তু তিনি ঘুষ খান, তার আচরণ ভাল নয় সেক্ষেত্রে তার আত্মমর্যাদা নাও থাকতে পারে।

ব্যক্তির মর্যাদা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ, দ্বিতীয়ত তার ক্ষমতা। অভ্যন্তরীণ গুণাগুণের ভিত্তিতে মানুষের যে মর্যাদা জোটে তা অধিক সময় স্থায়ী। মানুষের কাছে তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তবে সাধারণ বাস্তবতায় এদেশের ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা খুব কমই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হয়। মধ্যম ও নীচু ক্ষমতার মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা অধিক হয়। কিন্তু তবু দেশের দরিদ্র মানুষেরা মর্যাদা পায় না। এর প্রধানতম কারণ এ দেশে প্রচলিত ক্ষমতা ও শ্রেণীকাঠামো। কম আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি যখন বেশী মর্যাদা পেতে চায়, তখন তার মর্যাদা এবং আত্মমর্যাদা দুটোরই হ্রাস পাবার সম্ভাবনা থাকে। তবে মানবিক গুণাবলীর মাধ্যমে মানুষ যে ক্ষমতা অর্জন করে, তা কখনোই কোন ধরনের নেতিবাচক কাজে ব্যবহার হয় না।

ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য: ● সত্যবাদী ● সহমর্মী ● সহযোগী ● শ্রদ্ধাবোধসম্পন্ন ● আত্মবিশ্বাসী ● সদাচারী ● দায়িত্বশীল ● দেশাত্মবোধসম্পন্ন ● রুচিশীল ● সৎ ● পরোপোকারী ● ধৈর্যশীল ● সৎ সাহসী ● সদালাপী ● আত্মনির্ভরশীল ● কুসংস্কারমুক্ত।

মানুষ সমাজের জন্য কাজ করলে যে মর্যাদা পায় তাই সামাজিক মর্যাদা। কিন্তু প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় প্রকৃত সমাজ সেবকগণ মর্যাদা পাচ্ছেন না, পাচ্ছেন ধনসম্পদের অধিকারী ব্যক্তিগণ। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, সমাজে যে সকল মানুষ অন্যদের নিয়ে সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন তারাও সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হন।

আত্মমর্যাদা বোধ বেশী থাকলে মানুষ তার শ্রেণী তথা ক্ষমতা কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। আর তাই আত্মমর্যাদাবান মানুষের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সমাজের বেশীর ভাগ মানুষের মধ্যে তার মানবীয় গুণগুলো সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান। আবার অনেকের মধ্যে সেগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে দেখা যায়। কখনো কখনো আমরা দেখি যে, একজন অপরিচিত মানুষকে (অন্ধ/ প্রতিবন্ধী/বৃদ্ধ) কোন এক পথচারী সহযোগিতা করছে। এক্ষেত্রে যে মানুষটি সহযোগিতা করছেন, তিনি হতে পারেন সমাজের নিম্ন শ্রেণীর বা সমাজে প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত ব্যক্তি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সামাজিক মর্যাদা না থাকলেও তার মানবীয় গুণ থাকে। যার পরিপ্রেক্ষিত তিনি হন একজন আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তি।

দাস যুগে চাবুকের ভয়ে, সামন্ত যুগে ভূমি মালিকদের ভয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদা দেয়া হতো। সমাজের আকার কখনো ছোট হয় আবার কখনো বড় হয়। কখনোবা কয়েকটি সমাজ মিলে একটি বড় সমাজ গঠিত হয়। আবার প্রয়োজনের তাগিদে একটি বড় সমাজ ভেঙে ছোট ছোট কয়েকটি সমাজ গড়ে ওঠে। তাহলে দেখা যাক কি কি কারণে সমাজ গড়ে ওঠে:

১. স্বার্থের ঐক্য সমাজ গড়ে তোলে

২. দরিদ্র অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে

৩. সমস্যা সমাধানের জন্য

৪. চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে

স্বার্থের ঐক্য সমাজ গড়ে তোলে। আমাদের সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ বসবাস করে। পেশাগত এবং শ্রেণীগত পার্থক্যের কারণে স্বার্থের ঐক্য ঘটে। সমাজে সবসময়ই স্বার্থের কারণে কিছু মানুষ একত্রিত থেকেছে ঠিক সে পর্যন্তই, যতক্ষণ না তাদের সেই স্বার্থ পূরণ হয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ভিন্নতা রয়েছে। আমরা দেখেছি কিছু কিছু সমাজে কুসংস্কার বিরাজমান। এই কুসংস্কারগুলোর আবির্ভাব ঘটেছিলো সমাজপতিদের স্বার্থের কারণেই। আর তাই বর্তমানে সমাজে বিরাজমান কুসংস্কারগুলো দূর করতে হলে সমাজপতিদের নিজেদের সংশোধন হতে হবে। কিন্তু তার উপায় কি? যদি গড়ে উঠে সংগঠিত উদ্যোগ তবেই সমাধান সম্ভব। কারণ এটি একটি বড় সমস্যা। আর বড় সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন বড় শক্তির।

দারিদ্র্য অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যেও অনেক সমাজ গড়ে ওঠে। এই সমাজগুলো গড়ে ওঠে দরিদ্র এবং ধনী উভয়ের পৃথক পৃথক উদ্যোগে। দরিদ্রদের দ্বারা গঠিত সমাজের উদ্দেশ্য হলো সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধান। আর ধনীদের যে নিজস্ব সমাজ, তা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যেই গড়ে উঠে। এ কারণেই সমাজে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজে বৈষম্যের আবির্ভাবের এটি একটি প্রধান কারণ।

সমস্যা সমাধানের জন্যও সমাজ গড়ে ওঠে। দরিদ্রদের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। যেগুলো সৃষ্টির মূল কারণ দরিদ্ররা নিজেরাই। বেহিসেবীপনা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-বিরোধ, অপরিকল্পিত পরিবার তৈরি, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি বিষয়ই দারিদ্র্যের মূল কারণ। দারিদ্র্যের আর একটি বড় কারণ হচ্ছে এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ। সহজে ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তির সুযোগ থাকার কারণে অনেকে একাধিক উৎস থেকে ঋণ নেয়, সে ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ নিয়মিত করতে না পারার কারণে তাকে আরও অন্য উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়, অনেক ক্ষেত্রে এনজিও-র কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয়। এভাবে অনেক পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে যাবার পর তারা তখন কারও কাছ থেকে ঋণ পায় না। কারণ সমাজ তখন তাদের বিশ্বাস করে না।

এছাড়া দারিদ্র্যের বড় একটি কারণ হলো মামলা- মোকাদ্দমা। যে মামলা করে এবং যার বিরুদ্ধে মামলা করে তারা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কার্যত সমাজের কিছু দুষ্ট চরিত্রের লোক অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে বিরোধ লাগিয়ে দিয়ে মামলা করার জন্য প্ররোচনা দেয়। এভাবে মামলা দেওয়ার পর নিজেদের মধ্যেই কৃত্রিম প্রতিপক্ষ সাজিয়ে মামলা লড়তে উৎসাহ যোগায়। এভাবে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দরিদ্রতর হয়ে পড়ে।

উপরের আলোচনাটুকু তৃণমূলের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগীতায় বাংলাদেশে একদল উজ্জীবক গণগবেষণা শুরু করেছেন, ২০০৬ সালের ডিসেম্বর থেকে। মূলত গণগবেষণা চলমান রয়েছে ইউনিয়ন পর্যায়ে। গণগবেষণার নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্থানীয় সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত দরিদ্র নারী-পুরুষ। গণগবেষণার উদ্দেশ্য– ক্ষুধামুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত গণজাগরণে সমাজের এই সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত দরিদ্র নারী-পুরুষের মালিকানা ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

বস্তুত দরিদ্রদের নিজেদের মধ্যে মৌলিকভাবে তেমন কোন বিরোধ নেই, ব্যবহারিক জীবনে সাধারণ যে বিরোধগুলি দেখা যায়, সেগুলি খুবই সাদামাটা বিষয় নিয়ে ঘটে থাকে, যা সাধারণ কিছু আলাপ- আলোচনার মধ্য দিয়েই মিটিয়ে ফেলা সম্ভব। তাছাড়া, তাদের নিজেদের মধ্যে যা কিছু বিরোধ দেখা যায়, তা মূলত অবস্থাসম্পন্নদের চাপিয়ে দেওয়া বিরোধ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমপর্যায়ের অংশগ্রহণই পারে দারিদ্র্যমুক্ত একটি সামাজিক পরিবেশ তৈরি করে দিতে। ফলে এটি সুস্পষ্ট যে, সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে নতুন সমাজের আবির্ভাব ঘটে।

মো. মাহমুদ হাসান রাসেল
কার্যক্রম কর্মকর্তা
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

শর্বরী আলোময়ী

তাঁর প্রতি বিনম্র প্রণাম

যে বয়সে চলে গেলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষক প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে আবশ্যিকভাবেই অকালপ্রয়াত বলা যাবে না। পরিণত বয়সেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন অমর্ত্যলোকে। কিন্তু তারপরও এই মৃত্যুর আকস্মিকতা কী গভীরভাবে স্তব্ধ করে দিয়েছে আমার মত তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহীকে। এমন সর্বজনপ্রিয় একজন মানুষের অন্তিম বিদায়ের জন্যে আমাদের বোধ হয় কিছুটা মানসিক প্রস্তুতির দরকার হয়। কিন্তু কী অবাক হওয়ার মত বিষয় যে, বিগত কিছু কালে আমাদের বেশ কয়েকজন স্বজন, অবিসংবাদিত অভিভাবক, আমাদের সমাজের চলমান অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা প্রণম্য কয়েকজন তর্কাতীত বড় মাপের মানুষ হঠাৎ করেই, কোন রকমের জানান না দিয়েই চলে গেলেন, আমাদের দৈন্যদশাকে বিপুলভাবে বাড়িয়ে দিয়ে তারা ছিন্ন করে দিলেন সব পার্থিব সম্পর্ক।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরীও পরিণত বয়সে জীবনের ইতি টেনেছেন, শেষ দিকে চলাফেরা, মানুষের ভিড়ের মধ্যে যোগ দেয়া প্রভৃতি সীমিত হয়েছিল কিছুটা, কিন্তু ঘরোয়া জীবনযাপনে তেমন কোন সমস্যা ছিল না তাঁর, শরীরে বাসা বাঁধেনি কোন দুরারোগ্য ব্যাধি, কোনরকমের কষ্টে ভুগছিলেন না তিনি, তবুও এক সকালে হঠাৎ করেই এই সংবাদ এসে হিমেল উত্তুরে বাতাসের মত শরীর-মনকে অবশ করে দিয়ে জানিয়ে দিল, কবীর চৌধুরী আর নেই। নির্বাক স্থিরতায় এই সংবাদের আছড়ে পড়া আঘাতে মুহ্যমান হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

কী অসাধারণ এক মানুষ ছিলেন বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। এমন ধীমান এবং সাহিত্য-ইতিহাস-সংস্কৃতি-ধর্মচিন্তা বিবিধ বিষয়ে অধ্যয়নের সীমাটা প্রতিদিন অতিক্রম করে যাওয়া ব্যক্তি আমাদের সমাজে একান্ত বিরল। যে বয়সে তাঁর মত সাফল্যের সোপান পেরোনো ব্যক্তিরা বড় জোর কোন এক অনুলেখকের সহায়তায় আত্মজৈবনিক ঘটনার তালিকা তৈরি করেই কর্তব্যের দায়ভার মিটিয়ে থাকেন, তখনো বিচারপতি হাবিবুর রহমান প্রতিদিনই কোন না কোন বিষয়ে কিছু লিখছেন এবং তা-ও কোন সাধারণ বিষয়ে নয়, সর্বদাই জ্ঞানের অলিগলির রহস্য ভাণ্ডার থেকে ছেঁকে আনছেন তেজোদীপ্ত আলো। সেই তিনি, যিনি দেখা হলেই সহাস্য বদনে রসিকতার সঙ্গে বুদ্ধির জৌলুস ছড়িয়ে কুশল বিনিময় করতেন, তিনি আমাদের সবাইকে প্রায় বিমূঢ় করে দিয়ে, রাতের আঁধার ঘন হয়ে ওঠার আগেই টেলিভিশনের চলমান সংবাদধারায় নিষ্ঠুরতম খবরের অন্যতম অংশ জুড়ে হয়ে আমাদের ভেতরটা অসহায়ভাবে কাঁকিয়ে দিলেন, অসহনীয়ভাবে, না, এর জন্যে আমরা একটুও প্রস্তুত ছিলাম না। কয়েক ঘন্টা দেরি করলেও হয়ত বুঝতে পারতেন কী বিপুল ভালোবাসার আধার ছিলেন তিনি। বিনামেঘে বজ্রপাতের চেয়েও আরও কোন প্রবচনের বড় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আর প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ! যখন খবরটা জেনেছি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের ফোন মারফৎ, তখন সূর্যটা পুব থেকে দক্ষিণের দিকে অনেকটা সরে গেছে। তিনিও তো কোন বড় রকমের কষ্টকর রোগে ভুগছিলেন না। বয়স হয়েছিল, একাই থাকতেন, শরীরটা দুর্বল হয়েছিল, সে-ও নেহাতই বার্ধক্যের কারণে, তাই বিগত দুই তিন বছরে বাইরে আসাটা কমিয়ে দিয়েছিলেন। তা-ও বেরোতেন, যেসব সভায় যাওয়ার মধ্যে তাঁর অন্তর্গত অঙ্গীকার থাকতো অথবা প্রিয়জনের যে অনুরোধ রাখতে তাঁর ভেতর থেকেই সাড়া জাগতো, প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ সেসব জায়গায় উপস্থিত থাকতেন।

যাঁরা কাছ থেকে তাঁকে দেখেছেন, বুঝতেই পারতেন তার উপস্থিতি ও সান্নিধ্যের স্বাতন্ত্র্য। তিনি ছিলেন মিতবাক, মৃদুবাক, স্থিতবাক এবং অনুচ্চবাক। কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁকে অন্তর্মুখী বলা যাবে না, নিজেকে ঠিক গুটিয়ে রাখতেন না। আবার তাঁর সমসাময়িক অথবা অনুজ অনেক বুদ্ধিজীবীকে যেমন দেখা যায়, তাদের উপস্থিতিকে জানিয়ে দেবার জন্য কণ্ঠের তীব্রতার মাত্রা বৃদ্ধি করেন, নেতৃত্বের একটা আবহ সৃষ্টিতে সজাগ ও তৎপর; সরকার, সংবাদপত্র ও বিভিন্ন গণমাধ্যম তাদের ছবি তুলতে অনেক আগ্রহী, তাদের সাক্ষাৎকার নেবার জন্য সভাস্থলে বা শহীদ মিনারে সংবাদকর্মীরা ছোটাছুটি করেন। প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ ওই গোত্রভুক্ত মানুষ ছিলেন না।

সে কারণেই অন্যান্য বুদ্ধিজীবী নেতাদের সাধারণ মানুষ যেমন করে চেনেন, তিনি তেমন পরিচিত ও জনপ্রিয়তা লাভ করেননি। অবশ্যই এতে তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি এবং আমরা যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি, তাঁর স্নেহের রাজ্যের বাসিন্দা, খুব সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারি এ নিয়ে তাঁর কোন ধরনের আক্ষেপ ছিল না। দেশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কথা বলার জন্য তাঁর মাপের তুলনায় অনেক বামনকে গণমাধ্যম থেকে খুঁজে বেড়ানো হয়, কিন্তু সালাহ্উদ্দীন আহ্মদের ভাষ্য বা অভিমত প্রচার করার জন্য তাদের তৎপরতা লক্ষ করা যায়নি। এই ঢাকায় কত না সভা হয় প্রতিদিন, প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ হয়ত উপস্থিত থেকেছেন তার মধ্যে একটি বা দু'টিতে, সারা বছরে। আমার অকালপ্রয়াত বন্ধু কবি-অধ্যাপক খোন্দকার আশরাফ হোসেন লঘু স্বরে একটা কথা বলতেন, 'আমাদের দেশে কিছু মানুষ আছেন, তাঁদের দেখে মনে হয়, তারা যেন সভাপতি হবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করেছেন।' বলা বাহুল্য, সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ সেই দলভুক্ত নন।

কিন্তু এই শব্দাবলি রচনা করার সময় তাঁর সেই যে পরম সুশোভন উদার মুখশ্রী আমার মনের মুকুরে ভেসে উঠেছে, তার মধ্যে যেন চিরায়ত সারস্বত ভাবনার একটা সজীব এবং মূর্ত রূপ ফুটে ওঠে। অবশ্য আমার এমন মন্তব্যের মাধ্যমে আমি অন্যান্য চেনামুখ বুদ্ধিজীবীবৃন্দকে খাটো করে দেখছি, তা ভাবলে ভুল হবে। প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদের চরিত্রটাও ছিল ওইরকম। মানুষের সঙ্গে মিশতে অনুরাগ ছিল না, তা বলা যাবে না। ছোট বড় সবাইকে গভীর মমতা ও ভালোবাসায় কাছে টেনে নিতে পারতেন।

দেশে যে এত রকম অনাচার হচ্ছে, ইতিহাস-বিকৃতি চলছে, বাঙালি সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত হচ্ছে, মৌলবাদী চিন্তা-চেতনার উত্থান ঘটছে, জাতীয় পতাকা যে খুঁটির ওপর উড্ডয়নমান, তার চূড়ায় বসে শকুন রোদ পোহাচ্ছে, এসব বিষয়ে দেশে বেশ উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ হয়েছে; তার কিছুটা সুফল হয়ত পাওয়া গেছে, যতটা আশা করা হয়েছিল, তা হয়ত হয়নি; সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ এই সবকিছুর এক সংক্ষুব্ধ সাক্ষী। অন্যদের মত ক্ষোভ প্রকাশ করতে হয়ত লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েননি। কিন্তু ব্যক্তিগত সূত্রে জানি, তাঁর আস্থাভাজন দু'চারজন ছিলেন, যাদের তিনি এমন অনুমতি দিয়েছিলেন, প্রগতিপন্থার পক্ষে যে কোন বিবৃতিতে তার স্বাক্ষর জুড়ে দিতে যেন তারা দ্বিধা না করেন।

সাধারণভাবে, সৌম্যকান্তি প্রশান্ত মুখমণ্ডলের এই মানুষটি ছিলেন সমকালীন ইতিহাস পঠন-বিশ্লেষণে এক অক্লান্ত শিক্ষাব্রতী। অধ্যাপক সুশোভন সরকারের যথার্থ ছাত্র তিনি। বাঙালি সমাজের উদারনৈতিক বহুত্ববাদী চরিত্রটা অনুসন্ধান করতে এবং তার প্রতিষ্ঠাকল্পে যে ঐতিহাসিক মতধারাকে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন, সে বিষয়ে সর্বদাই কথা বলতেন। অনেকদিন বেশ দীর্ঘ সময় ধরে তার বাসায় নানা বিষয়ে কথা হয়েছে।

তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, সেসময় কোনদিন তাঁর বাসায় যাবার সাহস হয়নি। পরে বুঝেছি, ওই ভয় ছিল অমূলক। ১৯৭৩ সালে চলে এলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। থাকতেন নীলক্ষেতে পেট্রল পাম্পের পেছনে। ওঁর স্ত্রী ছিলেন গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের অধ্যক্ষ। নিঃসন্তান দম্পতির অবিমিশ্র ঝোঁক পড়াশোনার প্রতি।

সত্তরের দশকের ঠিক মাঝামাঝি বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হবার পর বুঝতে পারলাম, কী গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তার হৃদয়ের ভেতর। সে শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসের ওই মহানায়কের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য নয়; তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে যেসব অসাধারণ অর্জন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রধান উপাদান ছিল, সেইগুলো যেন ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করবে। সেই সময় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যা বুঝেছি এবং আমাদের সকলেরই বোধ সেইকালে এবং উত্তরকালে, তা হল দেশটা শুধু রাজনীতি ও গণতন্ত্রচর্চায় পিছিয়ে পড়বে না, প্রশাসনযন্ত্রের ওপর পাকিস্তানী কায়দায় সামরিক বাহিনীর আছর ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠবে। প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ নিশ্চুপ থেকে অনেকের কাছেই তার শঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন।

আমার আর এক বন্ধু আমাকে জানিয়েছিলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম জামাতপন্থী এক শিক্ষকের নিয়োগ প্রাপ্তির পর তিনি কী ভীষণভাবে বিচলিত বোধ করেছিলেন। নিজে অমন activist ছিলেন না, তাই অনুজ সহকর্মীদের নিজের বাসায় ডেকে তা প্রতিরোধ করার পন্থা বাতলে দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, তা কাজে লাগেনি। কিছু চেনামুখ বুদ্ধিজীবী এই প্রতিরোধ উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানাতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ খুব বেশি লেখেননি। সেটা আমাদের জন্য পরম দুর্ভাগ্যের। সাধারণ পাঠক তাঁর মনের নাগাল তেমনভাবে পাবেন না। কিন্তু তিনি তাঁর অনুসারী কয়েক গুচ্ছ বিবেকবান, স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন, মৃত্তিকাসংলগ্ন, উদার চিন্তায় বিশ্বাসী ও দেশ এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ ইতিহাসবিদ সৃষ্টি করে গেছেন তিনি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যোগদানের পর তাঁর নেতৃত্বে এবং ড. এ আর মল্লিকের সমর্থনে যে ইতিহাসের পাঠক্রম পুনর্চয়ন করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাস ও সভ্যতা, প্রত্নতত্ত্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পুনর্পাঠে তা ছিল প্রায় বৈপ্লবিক।

তার প্রতি গভীর ও বিনম্র প্রণাম জানাই।

শর্বরী আলোময়ী
শিক্ষক ও সংস্কৃতিকর্মী

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

সেই তিনি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

সদ্য প্রয়াত হলেন দেশের অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব, নামে যিনি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। সময়টা কি খুবই ট্র্যাজিক যাচ্ছে? যেন বা একে একে নিভিছে দেউটি। এই সেদিন হারালাম আমাদের গৌরবের অন্যতম প্রতিনিধি জাতীয় অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ ড. সালাহ্উদ্দিন আহ্মেদকে। তারপর কটা দিনই বা গেল, অনন্তধামে পাড়ি দিলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। আমাদের এমনতরই দুর্ভাগ্য, কী যে অতল শূন্যে অবস্থান আমাদের।

কেমন যে লাগছে প্রায় সাড়ে ছয় দশকের মতো কাল আমরা কাটিয়েছি একসঙ্গে- আমি ও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। এখন তিনি হারিয়ে গেলেন আরেক ধামে। স্বভাবতই একান্ত করে স্মৃতিচারণায় পেয়ে বসেছে আমাকে। হা-হুতাশ করব, না স্মৃতিচারণা করব, কিংবা মূল্যায়ন করব সেই তাঁকে-বুঝে উঠতে পারছি না। তবে প্রতিভার বরপুত্র জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে যথার্থ অর্থে তাঁর তাবৎমাত্রিকতাসহ মূল্যায়নের অবকাশ এই ক্ষণে মোটেই নেই বলেই মনে করি। সে জন্য সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু হুতাশেই বা ফায়দাটা কী? সে তো নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার চাইতে খানিকটা হলেও স্মৃতিচারণার প্রয়াস পাওয়া যাক। আজকের দিনের প্রজন্মের কাছে বরং তাঁকে খানিকটা হলেও তুলে ধরতে চাই।

সময়টা বোধ হয় গত শতাব্দীর চল্লিশ দশকের শেষভাগ। তখন সবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে নাম লিখিয়েছি। আমি ও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী - আমাদের পারস্পরিক পরিচিতির, কাছাকাছি আসবার দিনগুলো সম্ভবত আরও কিছুটা পরের। তাঁর সম্পর্কে শোনাটাই পয়লা, খ্যাতি শুনতাম কলকাতা থেকে এখানে এসেছে এক মেধাবী ছাত্র, সে ইংরেজী বিভাগের। পাশাপাশি ঘরে আমরা তখন পড়ি বাংলা বিভাগে। খুবই নামকরা ছাত্র জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সঙ্গে শুরুতে সেইটে সেতুবন্ধ। তবে মুখোমুখি পরিচয় লেখালেখির মাধ্যমে। সিদ্দিকী সাহেব কখনোই তেমন অভ্যাবাজ ছিলেন না। তাঁর বিচরণ প্রধানতই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও শ্রেণিকক্ষে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়ের কথাটা যে বললাম, যতটা মনে পড়ছে সেটা হয়েছিল মধুর চায়ের দোকানে, ইংরেজি বিভাগেরই অন্যতম ছাত্র কবি শামসুর রাহমানের মাধ্যমে। শামসুর রাহমান সে সময় আমাদের আড্ডায় ঘনিষ্ঠ এক সতীর্থ। সেকালে এবং বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি বেশ রোমান্টিক কবিতা লিখতেন। তিনিই একই বিভাগের জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে টেনে এনেছিলেন আমাদের ওই আড্ডায়।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে প্রথম দেখায় মনে হলো লাজুক প্রকৃতির ছেলেটি স্বভাবতই নম্র। অন্য সূত্রে জানা গিয়েছিল, নবাগত তিনি কবিতা লিখে থাকেন । তাই স্পষ্টই মনে পড়ছে, আমাদের সবার চাপাচাপিতে ওই 'নবাগত' জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী নিজের লেখা একটি কবিতা পাঠ করেছিলে সেদিন। তাঁর সে কবিতাটি ছিল ভারি রোমান্টিক। সে সময়টায় আমাদের মধ্যে বাম ধারার আন্দোলনের ও লেখালেখির ঢেউ। আবারও বলি, তবু সেদিন পঠিত এই কবিতাটি মনের মাঝে নতুন আবেগের নাড়া দিয়েছিল। তার পরের থেকে লেখালেখির সড়কে আমাদের পথচলা। এর মধ্যে সময়ের টানে কখন যে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

এদিকে সব ছাপিয়ে এসেছে ভাষা আন্দোলনের জোয়ার। নিত্য গ্রন্থাগারে পাঠরত, শ্রেণিকক্ষে নিবিষ্ট মেধাবী ছাত্র, পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফলের অধিকারী জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি তিনিও যে কখন জড়িয়ে পড়েছেন আমাদের সঙ্গে একই কাতারে।

স্মৃতিচারণার পয়লা পালার কথা বললাম এতক্ষণ। এইখানেতে খানিকটা ছাত্ররাজনীতির কথাও এসে পড়ে। আমি নিজে যে বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলের নির্বাচিত সহসভাপতি, পরের বছরেই ওই একই হলের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে আরও কত স্মৃতি আছে, সব আজ আর মনেও নেই। আসলে আমাদের দুজনের এত দীর্ঘকালের পথচলা, স্মৃতিচারণা, এ তো প্রায় মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের বৃত্তান্ততুল্য। আজকের অবকাশে তাতে কাজ নেই।

বরং এখন তবে দ্বিতীয় পালায় আসা যাক। এর মধ্যে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর জীবনেও স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে যাওয়ার মেলা কিছু ঘটেছে। আমার নিজের জীবনেও ওলট-পালট কম নয়। ছাত্রজীবনের পর কিছুদিনের জন্য হলেও আমরা দুজন দুই ভুবনের বাসিন্দা। সিদ্দিকী সাহেব বরাবরই লেখাপড়ায় এক ধাপ থেকে আরেক উচ্চতর ধাপে; দেশের সীমানা পেরিয়ে অক্সফোর্ডে তিনি পড়াশোনা করলেন। আর আমার বেলাতে হাতেখড়ি হলো সাংবাদিকতায়, এরপর যুক্ত হই অধ্যাপনার সঙ্গে।

এরপর আবারও আমি আর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী-আমরা একই কাতারে-সেইটে অধ্যাপনার অঙ্গন। আমাদের ওঠাবসা, কাজকর্ম, অধ্যাপনা, লেখালেখি-সবকিছুই জীবনভর বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম কয়েক বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, তার পরের থেকে শেষতক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। যে কয়েক বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম, সেই সময়টায় অর্থাৎ গত শতকের ষাটের দশকে দেশজুড়ে আন্দোলন- আমরা সবাই জড়িয়ে পড়েছি পাকিস্তানি আগ্রাসনের মোকাবিলায়-চাই বাঙালিত্বের প্রতিষ্ঠা, বাঙালিত্বের জয়। আর এখানে রয়েছেন অবশ্য করেই জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীও। এ সময় শুরু হলো রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও এই দেশে রবীন্দ্র সঙ্গীতচর্চার উদ্বোধনের কর্মযজ্ঞ। সেই ইতিহাসের ধারায় বারংবার দেখি সিদ্দিকী সাহেবের মুখ। এসব অলমিতি বিস্তরেণ।

তবে এই রাজশাহী পর্বে বিশেষ করেই জানাই, আমাদের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত সেই বিশেষ পত্রিকাটির কথা-পূর্বমেঘ। অত বছর আগে ঘোরতর সেই মফঃস্বল শহর রাজশাহী থেকে অমন মানের একটি সাহিত্য পত্রিকা দশ-বারো বছর ধরে নিয়মিত বেরিয়েছে, এটা ভাবতেও আজ অবাক লাগে। যতটা মনে পড়ছে, পত্রিকাটি বের করা হয়েছিল ১৯৬১-তে। বেশ কিছুসংখ্যক নতুন লেখককে প্রতিষ্ঠিত করেছে পূর্বমেঘ। এ পত্রিকার জন্য লেখা সংগ্রহ, লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ, প্রাপ্ত ও নির্বাচিত লেখাগুলোকে পরিমার্জনায় জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মূল অবদান বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করে বলি, পূর্বমেঘ-কে অমন উচ্চতর মানে উন্নীত করেছিল সিদ্দিকী সাহেবের ভূমিকা। তাই জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও পূর্বমেঘ অবশ্য করেই অবিচ্ছেদ্য।

এইবার অবশেষে বলব জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের, বিশেষত জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর জীবনযাপনের কথা। এক কথায় বলতে গেলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগটিকে শুরুর থেকেই গড়ে তুলেছেন তিনি। অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা তো তাঁর ছিলই, এখন অতঃপর পেলেন সংগঠকের ভূমিকা। ইংরেজি বিভাগটিকে ষোলো আনা রূপদান, তা তাঁরই অবদান। কেবল শুধু বিশেষ একটি বিভাগইমাত্রই নয়, এক দুঃসময়ে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবেও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর ভূমিকা প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ইতিতে নিবেদন করি যে, সুহৃদ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর তিরোধানের পর তাঁর বিপুল কর্মযজ্ঞের মূল্যায়ন, যেমনটা সূচনাতেই বলা গেছে, এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সেটি যথার্থভাবে করা সম্ভব নয়। আমার, সমকালীন আমাদের অবলোকনে, স্মৃতিতে তিনি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

আজকের দিনে স্মৃতিচারণার এই অবকাশে সহযাত্রীবান্ধব জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর উদ্দেশে আমার হৃদয় নিংড়ানো যত শ্রদ্ধার, ভালোবাসার উৎসর্গ।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম
জাতীয় অধ্যাপক

[২১ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের প্রথম আলো-এ প্রকাশিত লেখার পুনর্মুদ্রণ]

শাহ মো. জিয়াউদ্দিন

বিশ্ব শিক্ষক দিবসের দুই দশক এবং আমাদের শিক্ষা

বিশ্ব শিক্ষক দিবসের পটভূমি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনসহ বহু জাতীয়, আর্ন্তজাতিক সংস্থা ১৯৯৪ সাল থেকে অক্টোবর মাসের ৫ তারিখ বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। এবারও প্রতি বছরের ন্যায় পৃথিবীর ১০০টি দেশ এবং Education International-এর সদস্যভুক্ত ৪০১টি সংস্থা দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করেছে। Education International-এর এই দিবসটি পালনের মূল্য উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষক পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা সমাজে যে অবদান রাখছেন সে সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা। তাছাড়া শিক্ষকদেরকে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে সহযোগিতা করা, যাতে করে এই শিক্ষকরা আগামী এবং বর্তমান প্রজন্মকেও সুন্দর একটি পৃথিবী গড়ার নির্দেশনা দিতে পারে। ২০১৩ সালে দিবসটি পালনে প্রতিপাদ্য হিসাবে বলা হয়েছিল A Call for Teacher এবং Education International ২০১২ সালের এই দিবসটি পালনের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছিল Take a stand for teachers!। ২০১২ সালের এই দিবসটি যৌথভাবে পালন করে International Labour Organization, UNDP, UNICEF এবং Education International (EI)। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, দিবসটি পালনের সাথে শ্রম, মেধা ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

দিবসটি পালন শিক্ষকদের আত্মমর্যাদার সঙ্গে জড়িত। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে যে ভূমিকা, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। পণ্যের মানের ন্যায় শিক্ষার মানও নিরূপিত হয়। আমরা দেখি, কোন শিক্ষার্থীকে কর্মজীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে বা উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি সরকারি না বেসরকারি তা গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক নিয়োগের নানা দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ দেশের শিক্ষকদের জাতীয়ভাবে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া চলে। দেশের সকল শিক্ষক একই স্তরে একই কাঠামোয় অবস্থান করে, একই পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠদান করার পরও তাদের সম্মানীসহ পদোন্নতির ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারি নীতি ও অনুদানে পরিচালিত হয়।

আর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে দু'ধরনের। এক, বাণিজ্য ভিত্তিক, দুই, এমপিওভুক্ত যাকে বেসরকারি বলা হয়। বাণিজ্য ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদানের প্রয়োজন হয় না। এই প্রতিষ্ঠানগুলি মুনাফা লাভের জন্য গড়ে উঠেছে, এই সকল প্রতিষ্ঠান অনেক সময় সরকারের নিয়মনীতি ও পদ্ধতি মানতে চায় না। এ ধরনের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের শিক্ষা নীতি ও পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাণিজ্যভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের বেতন সম্মানী সরকারি বা এমপিওভুক্তদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বেসরকারি হিসাবে অভিহিত এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারের সকল নিয়ম নীতি মেনে পরিচালিত হয়। এই এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার সরকারই বহন করে, কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করে। দেশের এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষা কারিকুলাম ও পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হয়। সরকারের প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসনিক ও শিক্ষাপদ্ধতির কার্যক্রম পরিচালিত হয় । উভয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগ্যতার মাপকাঠি একই ধরনের। কিন্তু আর্থিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বৈষম্য চোখে পড়ার মতো। সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনের সুনির্দিষ্ট কাঠামো রয়েছে, সেই কাঠামো অনুসারে তারা বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, সরকারের অন্যান্য সংস্থার কর্মীদের ন্যায় সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন কিন্তু বেসরকারি নামে অভিহিত এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের জন্য বেতন কাঠামো নামেমাত্র থাকলেও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নেই। এ ধরনের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা এমপিওভুক্ত কলেজে বা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে চাকুরী নিতে হলে প্রথমে তাকে সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সংস্থার নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তারপর এই নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে কলেজে বা উচ্চ বিদ্যালয়ে চাকুরীর জন্য আবেদন করতে হবে। উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজের পরিচালনা পর্ষদ এবং সরকারের নির্ধারিত নিয়মে গঠিত নিয়োগ কমিটির লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজের শিক্ষকতা করার জন্য নির্বাচন করা হয়। আর একই যোগ্যতা নিয়ে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজের শিক্ষক হিসাবে চাকুরী নিতে হলে সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। নিয়োগের পরীক্ষার বেলায় দেখা যাচ্ছে যে, একজন বেসরকারি এমপিওভুক্ত উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পেতে হলে তাকে দু'ধাপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হচ্ছে ।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও সরকারি শিক্ষকদের মাঝে রয়েছে বেতন বৈষম্যসহ নানা ধরনের পার্থক্য। একজন বেসরকারি এমপিওভুক্ত কলেজ শিক্ষক প্রভাষক হিসাবে তাকে নিয়োগ লাভের পর সর্বোচ্চ পদোন্নতি পায় সহকারি অধ্যাপক পর্যন্ত, তাও আবার ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। কারণ প্রতিটি বেসরকারি এমপিওভুক্ত কলেজে কতজন সহকারি অধ্যাপক হতে পারবেন তার একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক কোটা রয়েছে। ফলে দেখা যায় যে, একজন শিক্ষক প্রভাষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর সারা জীবন চাকুরী করেও আনুপাতিক কোটায় না পড়ার দরুণ প্রভাষক হিসাবেই অবসর গ্রহণ করতে হয়। আর সরকারি কলেজে প্রভাষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করাটা নির্ধারিত নিয়ম।

দেশের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মোট শিক্ষার্থীও প্রায় ৭০ ভাগ এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে। বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে শিক্ষাখাতে উন্নয়নের জন্য নেয়া হয়েছে নানাবিধ উদ্যোগ। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় শতভাগ ভর্তি, ২৬১৯২টি বিদ্যালয়ের ১,০৪,০০০ জন শিক্ষককে জাতীয়করণের আওতায় নিয়ে আসা ইত্যাদি।

বুনিয়াদী শিক্ষার স্তর হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে পদ মর্যাদার মিল নেই। বর্তমানে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পেতে হলে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার স্নাতক ডিগ্রী, তারপর শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর দুই বছরের সি ইন এড ডিগ্রী নিতে হয়। এই ডিগ্রী নেয়ার পর তাকে তৃতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদার কর্মচারী হিসাবে পরিগণিত করা হয়। এসএসসি পাশ করার পর একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাত বছর শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। অথচ একজন ডিপ্লোমা ধারী যিনি কর্মজীবনে উপ-সহকারি প্রকৌশলী পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন, তিনি কিন্তু এসএসসি পাশ করার পর, চার বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন, ডিপ্লোমাধারী উপ-সহকারি প্রকৌশলীকে সরকারিভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদার কর্মকর্তা হিসাবে মর্যাদা ও বেতন ভাতা দেয়া হয়। একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ডিপ্লোমাধারী উপ-সহকারী প্রকৌশলীর চেয়ে তিন বছর বেশী শিক্ষা গ্রহণ করলেও তাকে মর্যাদা পেতে হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে। ইউনেস্কো ইন্সটিটিউট ফর স্টেটিসটিকস্ অনুসারে মানসম্মত শিক্ষকের স্বল্পতার কারণে অনেক দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। অধিক শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও যেখানে প্রাথমিক শিক্ষকদের পদমর্যাদার বিষয়টি অন্য পেশার চেয়ে ছোট করে দেখা হয় সেখানে মানসম্মত শিক্ষক আশা করাটা অনেকটাই অর্থহীন।

বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নীত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন, সেই মোতাবেক মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকের সাথে সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের সমন্বয় সাধনের জন্য নতুন ভাবে পাঠক্রম সাজানোর চেষ্টা চলছে। মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নীতকরণ প্রসঙ্গে দেখা যায়, অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে লালন শাহের কবিতা মানবধর্ম। কবিতাটি নির্বাচনের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়ই বড়। শিক্ষার্থীরা জাতপাত বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা মিথ্যে গর্ব করা থেকে বিরত থাকবে। কবিতাটি প্রতিস্থাপিত হচ্ছে কবি ফররুখ আহমদের মেঘ বৃষ্টি আলোর দেশে কবিতা দিয়ে। ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা জর্জ হ্যারিসনের ছবিসহ দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ লেখাটি পড়ে, কিন্তু পরিমার্জন কমিটি লেখাটি বাদ দিতে চাইলে স্টিয়ারিং কমিটি আপস করেছে এইভাবে যে, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা লেখাটি পড়লেও গিটার বাজিয়ে গান গাওয়া ঝাঁকড়া চুলের জর্জ হ্যারিসনের ছবিটি সেখানে থাকবে না। অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে বিপ্রদাশ বড়ুয়ার গদ্য **মংডুর পথে** প্রতিস্থাপিত হচ্ছে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর মদিনার পথে লেখাটি দিয়ে। দশম শ্রেণীতে জ্ঞান দাশের কবিতা **সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু** প্রতিস্থাপিত হচ্ছে মুহাম্মদ সগীরের লেখা **বন্দনা** কবিতা দিয়ে। শুধু ভাষায় নয়, চিত্রায়নের নানা স্তরেও পরিবর্তন। তৃতীয় শ্রেণীর **আমার বাংলা বই**-এর প্রচ্ছদে হাফপ্যান্ট পরা যে বালকটি নৌকা বাইছে এবং যে বালিকাটি শাপলা ফুল তুলছে নৌকায় বসে, সেখানে প্রচ্ছদ পরিবর্তন করে বালকটিকে পায়জামা পরানো হবে এবং কিশোরীর মাথায় দেওয়া হবে হিজাব। পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের প্রচ্ছদে ফুল, পাখি, প্রজাপতি ও কাশবনের মধ্যে নৌকা বাইছে এক কিশোর আর নৌকার অন্য প্রান্তে বসা এক ফ্রক পরা কিশোরী, সেটিও পাল্টে মাদ্রাসা শিক্ষার উপযোগী করা হবে। পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদে নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়ানো নারীর ঘাড়ের পাশ দিয়ে সামান্য যে পিঠ দেখা যায়, শিল্পীর আঁকা সেই পিঠও দেওয়া হবে ঢেকে। তবে সবকিছুকে বোধ হয় ছাড়িয়ে গেছে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **তৈলচিত্রের ভূত** গদ্যটির শিরোনাম পরিবর্তনের সুপারিশ করে **তৈলচিত্রের আছর** নামকরণের প্রস্তাব করার মধ্য দিয়ে। এ থেকে বুঝা যায় যতই সমন্বয়ের চেষ্টা চালানো হউক না কেন এখানে ধর্মীয় সংস্কারের অবয়ব থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা মুক্ত হচ্ছে না। পরিবর্তনের পরও সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার একটি পার্থক্য থেকে যায়, এই পার্থক্য থাকার জন্য একজন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর মনোজগত ধর্মীয় সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দু থেকেই বিকশিত হয়। ধর্মীয় সংস্কারের আবর্তে গ্রহণকারী শিক্ষা সার্বজনীন হয় না। আর এ ধরনের শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত হবে যে নাগরিক সে কখনো সার্বজনীন ব্যবস্থার আলোকে কর্মক্ষম হবে না। আমাদের দেশের এ ধরনের দ্বিধাবিভক্ত পাঠক্রমের কারণে মেধাবীরা শিক্ষক পেশার দিকে ঝুঁকছে না। তাছাড়া বহুধা বিভক্তির শিক্ষাপদ্ধতি রয়েছে আমাদের দেশে। নানা ধরনের পাঠ্যক্রমের আলোকে শিক্ষা প্রদানের কারণে মানসম্মত শিক্ষক পাওয়া যায় না। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এমপিওভুক্ত এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত করে আনতে হবে। রাজনৈতিক প্রভাবের বলয়ে আবদ্ধ থাকায় মেধাবীরা শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পায় না।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে একটি বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করছি, ১. সুশিক্ষা ও মানসম্মত শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষকের আর শিক্ষকের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দান, অন্যদিকে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক শিক্ষা এবং চাহিদাভিত্তিক যুগোপযোগী পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত উৎকর্ষ সাধন। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার বিষয়টি এখনো পুরোপুরি বাস্তব রূপ পায়নি। মাদ্রাসা এবং সাধারণ শিক্ষায় অনেকগুলো বিষয় এখনো সমন্বয় করা হয়নি। শিক্ষক নিয়োগ বিষয়টিও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নয়। তাছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টি এখনো নিয়মিতকরণ করা হয়নি।

শিক্ষকদের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্তকরণই শিখন সংকটের সমাধান, এ কথা উল্লেখ করে সবার জন্য শিক্ষা, গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০১৩-১৪ এ যে দশটি প্রস্তাবনা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, ১. শিক্ষকদের ঘাটতি পূরণ করা। ২. শিক্ষাদান করতে সর্বোত্তম প্রার্থীদের আকর্ষণ। ৩. সকল শিশুর চাহিদাপূরণে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪. শিক্ষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মেনটর প্রস্তুত করা। ৫. চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। ৬. উত্তম শিক্ষকদের ধরে রাখার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পেশা এবং বেতন কাঠামোর ব্যবস্থা। ৭. সর্বোচ্চ ফলাফল পেতে শিক্ষাব্যবস্থায় সুশাসনের উন্নয়ন। ৮. শিখন উন্নয়নে শিক্ষকদের উদ্ভাবনী শিক্ষাক্রমের সঙ্গে পরিচিত করা। ৯. না শেখার ঝুঁকির মধ্যে থাকা শিক্ষার্থীদের সনাক্ত ও সহায়তা জন্য শ্রেণী কক্ষে মূল্যায়ন উন্নয়ন করা। ১০. প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের তথ্য প্রদান করা।

পৃথিবীর অনেক দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় হিসাবে অভিহিত করা হয়। আর তাই দেখা যায়, সেই সকল দেশের দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করতে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ অনেক বেশী দেয়া হয়। শিক্ষার মানোন্নয়ন, প্রসার তথা শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে গবেষণার কোন বিকল্প নাই। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় মাত্র ০.০৩ শতাংশ গবেষণার কাজে ধরা হয়েছিল, ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও তা বৃদ্ধি পায়নি। গবেষণায় যথেষ্ট বিনিয়োগ না হলে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

দেশে মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হলো কিছু পদক্ষেপ নেয়া দরকার সেগুলি হলো:

১. দেশের বহুধাবিভক্ত শিক্ষা পদ্ধতির সমন্বয় সাধন।
২. ১৯৬৬ সালে প্যারিসে শিক্ষকের মর্যাদা সংক্রান্ত আন্তঃসরকার সম্মেলনে ইউনেস্কো এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা শিক্ষকদের অধিকার, দায়িত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কে যে যৌথ সুপারিশমালা প্রণয়ন করে, তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা।
৩. শিক্ষকদের জন্য আলাদা সার্ভিস কমিশন গঠন এবং এক ধরনের নীতি এবং নিয়মের আওতায় দেশের সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত করা।
৪. অসাম্প্রদায়িক এবং বিজ্ঞানসম্মত শিখন পদ্ধতি চালু করা।
৫. আদিবাসী শিশুদের নিজস্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা।
৬. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য যথাযোগ্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন।
৭. প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি এখন পর্যন্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত। এই রুলস অফ বিজনেস পরিবর্তন করে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিক্ষার বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করতে হবে।
৮. ২০১২-১৩ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের ১১.২ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল- অন্যান্য খাতের সাথে তুলনা করলে এটা দ্বিতীয় বৃহত্তম। কিন্তু শিক্ষায় বরাদ্দকৃত মোট অর্থের ৬৮ শতাংশ রাজস্ব খাতে ব্যয় করা হবে বলে প্রস্তাব করা হলেও, এই বিশাল অঙ্কের অতি নগণ্য একটি অংশ (অনুন্নয়ন বাজেটের ০.৫%) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও মানোন্নয়নের জন্য রাখা হয়েছে। অতএব শিক্ষার সার্বিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য এই খাতে চলমান ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও তা বাড়েনি। আগামী অর্থবছরে শিক্ষক প্রশিক্ষণে এই বরাদ্দ বাড়াতে হবে।
৯. শিক্ষাখাতের সম্পূর্ণ বাজেট একত্রিতভাবে প্রকাশ না করা। শিক্ষার সকল স্তর যেমন, ধর্মীয় শিক্ষা, সামরিক শিক্ষা এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতের বরাদ্দ পৃথক করে দেখানো।
১০. শিক্ষকতা পেশায় উচ্চশিক্ষিত ও মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে শিক্ষকদের জন্য যুগোপযোগী বেতন কাঠামো প্রণয়ন ও পেশাগত দক্ষতার সাথে সঙ্গতি রেখে পদোন্নতির ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য পৃথক পে-কমিশন গঠন করতে হবে।
১১. দেশের বিশেষ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলসমূহ যেমন চর, হাওর, পাহাড় এবং শিক্ষায় তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের অবস্থা বিবেচনা করে যথাযথ ব্যয় নির্ধারণ। এতে শিক্ষা ক্ষেত্রের অর্থায়নের সমতা নিশ্চিত হবে এবং শিক্ষায় আঞ্চলিক বৈষম্য দূর হবে।
১২. প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে বয়স্ক শিক্ষা বিশেষ করে নারীশিক্ষার উপর জোর দেয়া।

শাহ মো. জিয়াউদ্দিন
কলামিষ্ট, রাজশাহী

[বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রাজশাহীতে ১৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে আয়োজিত সভায় উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ]

কর্ম কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। নিয়োগের পরীক্ষার বেলায় দেখা যাচ্ছে যে, একজন বেসরকারি এমপিওভুক্ত উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পেতে হলে তাকে দু'ধাপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হচ্ছে ।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও সরকারি শিক্ষকদের মাঝে রয়েছে বেতন বৈষম্যসহ নানা ধরনের পার্থক্য। একজন বেসরকারি এমপিওভুক্ত কলেজ শিক্ষক প্রভাষক হিসাবে তাকে নিয়োগ লাভের পর সর্বোচ্চ পদোন্নতি পায় সহকারি অধ্যাপক পর্যন্ত, তাও আবার ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। কারণ প্রতিটি বেসরকারি এমপিওভুক্ত কলেজে কতজন সহকারি অধ্যাপক হতে পারবেন তার একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক কোটা রয়েছে। ফলে দেখা যায় যে, একজন শিক্ষক প্রভাষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর সারা জীবন চাকুরী করেও আনুপাতিক কোটায় না পড়ার দরুণ প্রভাষক হিসাবেই অবসর গ্রহণ করতে হয়। আর সরকারি কলেজে প্রভাষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করাটা নির্ধারিত নিয়ম।

দেশের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মোট শিক্ষার্থীও প্রায় ৭০ ভাগ এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে। বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে শিক্ষাখাতে উন্নয়নের জন্য নেয়া হয়েছে নানাবিধ উদ্যোগ। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় শতভাগ ভর্তি, ২৬১৯২টি বিদ্যালয়ের ১,০৪,০০০ জন শিক্ষককে জাতীয়করণের আওতায় নিয়ে আসা ইত্যাদি।

বুনিয়াদী শিক্ষার স্তর হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে পদ মর্যাদার মিল নেই। বর্তমানে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পেতে হলে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার স্নাতক ডিগ্রী, তারপর শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর দুই বছরের সি ইন এড ডিগ্রী নিতে হয়। এই ডিগ্রী নেয়ার পর তাকে তৃতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদার কর্মচারী হিসাবে পরিগণিত করা হয়। এসএসসি পাশ করার পর একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাত বছর শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। অথচ একজন ডিপ্লোমা ধারী যিনি কর্মজীবনে উপ-সহকারি প্রকৌশলী পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন, তিনি কিন্তু এসএসসি পাশ করার পর, চার বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন, ডিপ্লোমাধারী উপ-সহকারি প্রকৌশলীকে সরকারিভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদার কর্মকর্তা হিসাবে মর্যাদা ও বেতন ভাতা দেয়া হয়। একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ডিপ্লোমাধারী উপ-সহকারী প্রকৌশলীর চেয়ে তিন বছর বেশী শিক্ষা গ্রহণ করলেও তাকে মর্যাদা পেতে হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে। ইউনেস্কো ইন্সষ্টিটিউট ফর স্টেটিসটিকস্ অনুসারে মানসম্মত শিক্ষকের স্বল্পতার কারণে অনেক দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। অধিক শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও যেখানে প্রাথমিক শিক্ষকদের পদমর্যাদার বিষয়টি অন্য পেশার চেয়ে ছোট করে দেখা হয় সেখানে মানসম্মত শিক্ষক আশা করাটা অনেকটাই অর্থহীন।

বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নীত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন, সেই মোতাবেক মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকের সাথে সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের সমন্বয় সাধনের জন্য নতুন ভাবে পাঠ্যক্রম সাজানোর চেষ্টা চলছে। মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নীতকরণ প্রসঙ্গে দেখা যায়, অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে লালন শাহের কবিতা মানবধর্ম। কবিতাটি নির্বাচনের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়ই বড়। শিক্ষার্থীরা জাতপাত বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা মিথ্যে গর্ব করা থেকে বিরত থাকবে। কবিতাটি প্রতিস্থাপিত হচ্ছে কবি ফররুখ আহমদের মেঘ বৃষ্টি আলোর দেশে কবিতা দিয়ে। ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা জর্জ হ্যারিসনের ছবিসহ দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ লেখাটি পড়ে, কিন্তু পরিমার্জন কমিটি লেখাটি বাদ দিতে চাইলে স্টিয়ারিং কমিটি আপস করেছে এইভাবে যে, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা লেখাটি পড়লেও গিটার বাজিয়ে গান গাওয়া ঝাঁকড়া চুলের জর্জ হ্যারিসনের ছবিটি সেখানে থাকবে না। অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে বিপ্রদাশ বড়ুয়ার গদ্য **মংডুর পথে** প্রতিস্থাপিত হচ্ছে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর মদিনার পথে লেখাটি দিয়ে। দশম শ্রেণীতে জ্ঞান দাশের কবিতা **সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু** প্রতিস্থাপিত হচ্ছে মুহাম্মদ সগীরের লেখা **বন্দনা** কবিতা দিয়ে। শুধু ভাষায় নয়, চিহ্নায়নের নানা স্তরেও পরিবর্তন। তৃতীয় শ্রেণীর **আমার বাংলা বই**-এর প্রচ্ছদে হাফপ্যান্ট পরা যে বালকটি নৌকা বাইছে এবং যে বালিকাটি শাপলা ফুল তুলছে নৌকায় বসে, সেখানে প্রচ্ছদ পরিবর্তন করে বালকটিকে পায়জামা পরানো হবে এবং কিশোরীর মাথায় দেওয়া হবে হিজাব। পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের প্রচ্ছদে ফুল, পাখি, প্রজাপতি ও কাশবনের মধ্যে নৌকা বাইছে এক কিশোর আর নৌকার অন্য প্রান্তে বসা এক ফ্রক পরা কিশোরী, সেটিও পাল্টে মাদ্রাসা শিক্ষার উপযোগী করা হবে। পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদে নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়ানো নারীর ঘাড়ের পাশ দিয়ে সামান্য যে পিঠ দেখা যায়, শিল্পীর আঁকা সেই পিঠও দেওয়া হবে ঢেকে। তবে সবকিছুকে বোধ হয় ছাড়িয়ে গেছে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **তৈলচিত্রের ভূত** গদ্যটির শিরোনাম পরিবর্তনের সুপারিশ করে **তৈলচিত্রের আছর** নামকরণের প্রস্তাব করার মধ্য দিয়ে। এ থেকে বুঝা যায় যতই সমন্বয়ের চেষ্টা চালানো হউক না কেন এখানে ধর্মীয় সংস্কারের অবয়ব থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা মুক্ত হচ্ছে না। পরির্বতনের পরও সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার একটি পার্থক্য থেকে যায়, এই পার্থক্য থাকার জন্য একজন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর মনোজগত ধর্মীয় সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দু থেকেই বিকশিত হয়। ধর্মীয় সংস্কারের আর্বতে গ্রহণকারী শিক্ষা সার্বজনীন হয় না। আর এ ধরনের শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত হবে যে নাগরিক সে কখনো সার্বজনীন ব্যবস্থার আলোকে কর্মক্ষম হবে না। আমাদের দেশের এ ধরনের দ্বিধাবিভক্ত পাঠ্যক্রমের কারণে মেধাবীরা শিক্ষক পেশার দিকে

ঝুঁকছে না। তাছাড়া বহুধা বিভক্তির শিক্ষাপদ্ধতি রয়েছে আমাদের দেশে। নানা ধরনের পাঠ্যক্রমের আলোকে শিক্ষা প্রদানের কারণে মানসম্মত শিক্ষক পাওয়া যায় না। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এমপিওভুক্ত এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত করে আনতে হবে। রাজনৈতিক প্রভাবের বলয়ে আবদ্ধ থাকায় মেধাবীরা শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পায় না।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে একটি বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করছি, ১. সুশিক্ষা ও মানসম্মত শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষকের আর শিক্ষকের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দান, অন্যদিকে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক শিক্ষা এবং চাহিদাভিত্তিক যুগোপযোগী পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত উৎকর্ষ সাধন। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার বিষয়টি এখনো পুরোপুরি বাস্তব রূপ পায়নি। মাদ্রাসা এবং সাধারণ শিক্ষায় অনেকগুলো বিষয় এখনো সমন্বয় করা হয়নি। শিক্ষক নিয়োগ বিষয়টিও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নয়। তাছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টি এখনো নিয়মিতকরণ করা হয়নি।

শিক্ষকদের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্তকরণই শিখন সংকটের সমাধান, এ কথা উল্লেখ করে সবার জন্য শিক্ষা, গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০১৩-১৪ এ যে দশটি প্রস্তাবনা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, ১. শিক্ষকদের ঘাটতি পূরণ করা। ২. শিক্ষাদান করতে সর্বোত্তম প্রার্থীদের আকর্ষণ। ৩. সকল শিশুর চাহিদাপূরণে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪. শিক্ষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মেনটর প্রস্তুত করা। ৫. চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। ৬. উত্তম শিক্ষকদের ধরে রাখার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পেশা এবং বেতন কাঠামোর ব্যবস্থা। ৭. সর্বোচ্চ ফলাফল পেতে শিক্ষাব্যবস্থায় সুশাসনের উন্নয়ন। ৮. শিখন উন্নয়নে শিক্ষকদের উদ্ভাবনী শিক্ষাক্রমের সঙ্গে পরিচিত করা। ৯. না শেখার ঝুঁকির মধ্যে থাকা শিক্ষার্থীদের সনাক্ত ও সহায়তা জন্য শ্রেণী কক্ষে মূল্যায়ন উন্নয়ন করা। ১০. প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের তথ্য প্রদান করা।

পৃথিবীর অনেক দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় হিসাবে অভিহিত করা হয়। আর তাই দেখা যায়, সেই সকল দেশের দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করতে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ অনেক বেশী দেয়া হয়। শিক্ষার মানোন্নয়ন, প্রসার তথা শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে গবেষণার কোন বিকল্প নাই। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় মাত্র ০.০৩ শতাংশ গবেষণার কাজে ধরা হয়েছিল, ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও তা বৃদ্ধি পায়নি। গবেষণায় যথেষ্ট বিনিয়োগ না হলে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

দেশে মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হলো কিছু পদক্ষেপ নেয়া দরকার সেগুলি হলো:

১. দেশের বহুধাবিভক্ত শিক্ষা পদ্ধতির সমন্বয় সাধন।

২. ১৯৬৬ সালে প্যারিসে শিক্ষকের মর্যাদা সংক্রান্ত আন্তঃসরকার সম্মেলনে ইউনেস্কো এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা শিক্ষকদের অধিকার, দায়িত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কে যে যৌথ সুপারিশমালা প্রণয়ন করে, তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা।

৩. শিক্ষকদের জন্য আলাদা সার্ভিস কমিশন গঠন এবং এক ধরনের নীতি এবং নিয়মের আওতায় দেশের সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত করা।

৪. অসাম্প্রদায়িক এবং বিজ্ঞানসম্মত শিখন পদ্বতি চালু করা।

৫. আদিবাসী শিশুদের নিজস্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা।

৬. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য যথাযোগ্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন।

৭. প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি এখন পর্যন্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত। এই রুলস অফ বিজনেস পরিবর্তন করে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিক্ষার বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করতে হবে।

৮. ২০১২-১৩ অর্থাবছরে জাতীয় বাজেটের ১১.২ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল- অন্যান্য খাতের সাথে তুলনা করলে এটা দ্বিতীয় বৃহত্তম। কিন্তু শিক্ষায় বরাদ্দকৃত মোট অর্থের ৬৮ শতাংশ রাজস্ব খাতে ব্যয় করা হবে বলে প্রস্তাব করা হলেও, এই বিশাল অঙ্কের অতি নগণ্য একটি অংশ (অনুন্নয়ন বাজেটের ০.৫%) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও মানোন্নয়নের জন্য রাখা হয়েছে। অতএব শিক্ষার সার্বিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য এই খাতে চলমান ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও তা বাড়েনি। আগামী অর্থবছরে শিক্ষক প্রশিক্ষণে এই বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

৯. শিক্ষাখাতের সম্পূর্ণ বাজেট একত্রিতভাবে প্রকাশ না করা। শিক্ষার সকল স্তর যেমন, ধর্মীয় শিক্ষা, সামরিক শিক্ষা এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতের বরাদ্দ পৃথক করে দেখানো।

১০. শিক্ষকতা পেশায় উচ্চশিক্ষিত ও মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে শিক্ষকদের জন্য যুগোপযোগী বেতন কাঠামো প্রণয়ন ও পেশাগত দক্ষতার সাথে সঙ্গতি রেখে পদোন্নতির ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য পৃথক পে-কমিশন গঠন করতে হবে।

১১. দেশের বিশেষ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলসমূহ যেমন চর, হাওর, পাহাড় এবং শিক্ষায় তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের অবস্থা বিবেচনা করে যথাযথ ব্যয় নির্ধারণ। এতে শিক্ষা ক্ষেত্রের অর্থায়নের সমতা নিশ্চিত হবে এবং শিক্ষায় আঞ্চলিক বৈষম্য দূর হবে।

১২. প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে বয়স্ক শিক্ষা বিশেষ করে নারীশিক্ষার উপর জোর দেয়া।

শাহ মো. জিয়াউদ্দিন
কলামিষ্ট, রাজশাহী

[বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রাজশাহীতে ১৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে আয়োজিত সভায় উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ]

শিক্ষকের জন্য বিনিয়োগ, ভবিষ্যতের বিনিয়োগ

ইউনেস্কো ইন্সিস্টিটিউট ফর স্ট্যাটিসটিকস্ অনুসারে মানসম্মত শিক্ষকের স্বল্পতার কারণে অনেক দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। এই প্রতিবেদন অনুসারে বিশ্বের প্রায় ৯৩টি দেশে শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে আরও ৪০ লক্ষ শিক্ষক প্রয়োজন। এই সকল শিক্ষককে অবশ্যই হতে হবে প্রশিক্ষিত, যারা আগামী প্রজন্মের বহুমুখী শিক্ষার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। ইউনেস্কোর আরও ১টি গবেষণায় বলা হয়েছে, যে সকল দেশে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা ৭৫%-এরও কম, সে রকম ৩০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে প্রায় ৪০ ভাগ শিক্ষকই প্রশিক্ষিত নয়।

শিক্ষকরাই জাতির বিবেক ও জাতির পথপ্রদর্শক। শিক্ষকই পারে তার মেধা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে জাতিকে উজ্জীবিত করতে। আগামী পৃথিবী যাদের হাত ধরে সামনে এগিয়ে যাবে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের যথাযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মহান ও গুরুদায়িত্ব পালন করছে শিক্ষকরাই। এ বাস্তবতার আলোকে এবার বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হলো 'Invest in the future, Invest in Teachers!' -এই প্রতিপাদ্য নিয়ে। যার বাংলা ভাষান্তর করা হয়েছে 'শিক্ষকদের জন্য বিনিয়োগ, ভবিষ্যতের বিনিয়োগ'। শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অধিক বিনিয়োগের উপর এবারের প্রতিপাদ্যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

২০১৩ সালের বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা বলেন, "Teachers' professional knowledge and skills are the most important factor for quality education. This World Teachers' Day, we call for teachers to receive stronger training upfront and continual professional development and support... " এই বাণীর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি আগামী প্রজন্মের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন শিক্ষা বিকাশের কারিগর হিসেবে নিয়োজিত শিক্ষক সমাজের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৯৪ সালের পর থেকে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী ৫ অক্টোবর পালিত হয় বিশ্ব শিক্ষক দিবস। পেছনে ফিরে তাকালে দেখতে পাই, ১৯৬৬ সালে প্যারিসে শিক্ষকের মর্যাদা সংক্রান্ত আন্তঃসরকার সম্মেলনে ইউনেস্কো এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা শিক্ষকদের অধিকার, দায়িত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কে একটি যৌথ সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। উক্ত সুপারিশমালায় শিক্ষকতা পেশাকে সম্মানজনক অবস্থানে নেয়াসহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নিয়োগ ও পদোন্নতি, দায়িত্ব ও অধিকার, চাকুরির নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাধীনতা, শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু সুপারিশমালা প্রণয়নের ৪৮ বছর পরেও অনেক উন্নয়নশীল দেশেই শিক্ষকদের অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি হয়নি।

বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে শিক্ষাখাতে উন্নয়নের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যেমন এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় শতভাগ ভর্তির উদ্যোগ, ২৬১৯২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১,০৪,০০০ জন শিক্ষককে জাতীয়করণের আওতায় আনা ইত্যাদি। দেশে বর্তমানে শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়লেও প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া শিক্ষকদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রেও রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। এক্ষেত্রে আর্থিক সীমাবদ্ধতাও অনেকাংশে দায়ী। পৃথিবীর অনেক দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় হিসাবে অভিহিত করা হয়।

আমরা আশা করি, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল বৈষম্য দূর করে সবার জন্য শিক্ষার পথ সুগম হবে। তবে প্রশিক্ষিত শিক্ষক বিষয়ে জাতীয় শিক্ষানীতিতে গুরুত্ব দেয়া হলেও তার আশানুরূপ বাস্তবায়ন আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পাই না। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বর্ণিত শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

- শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সময়ের সঙ্গে যুগোপযোগীকরণে সহায়তা দান।
- শিক্ষকদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি এবং নেতৃত্বেও গুণাবলী জাগ্রত করা।
- শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দেশের জরুরী সমস্যাগুলোর সাথে পরিচিত করা এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত করতে সাহায্য করা।
- শিক্ষণের জন্য আধুনিক উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন এবং তা ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা ও কৌশল বৃদ্ধি করা।

- গবেষণাপত্র তৈরি ও প্রতিবেদন পেশের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব অর্জনে সহায়তা করা।
- সমাজের সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্তা এবং প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের বিশেষ শিখন চাহিদা অনুসারে শিখন সেবা প্রদানের কলাকৌশল অর্জনে সহায়তা করা।
- তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় সকল স্তরের শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এর সর্বোচ্চ অনুশীলনে উৎসাহিত করা।

তবে জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষকদের দায়িত্ব, কর্তব্য, মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা এখন পর্যন্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে অনেক কৃতি শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষাজীবন শেষ করে এই পেশায় আসতে চায় না।

শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে গণসাক্ষরতা অভিযান ২০০৭ সাল থেকে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন এবং সহযোগী সংগঠনসমূহের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন করে আসছে। কিন্তু এ বছর এ সময়ে দেশের দুটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব থাকার কারণে অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহে (১৯-২২ অক্টোবরের মধ্যে যে কোন দিনে) দিবসটি উদযাপনের করা হয়। এ উপলক্ষে গণসাক্ষরতা অভিযান সমন্বয়ক হিসেবে সারা দেশে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি ও অন্যান্য পেশাজীবী সংস্থার সাথে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা সভা, মতবিনিময় সভা, সংবাদপত্রে গণআহ্বান প্রকাশ, র‍্যালী, মানববন্ধন ও উপকরণ তৈরি ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে।

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি আয়োজন

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযান জাতীয় পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত র‍্যালী ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া অভিযান-এর উদ্যোগে শিক্ষক দিবসের দাবিগুলো নিয়ে সরকার ও নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে পত্রিকায় উন্মুক্ত আবেদন (Open Appeal) প্রকাশ করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে অভিযানের বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত ৪টি শিক্ষক সংগঠনসমূহ ও ২৫টি সহযোগী সংগঠনকে নির্বাচিত করা হয়। এই কর্মসূচিগুলিতে সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের প্রতিনিধি স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, এসএমসি সদস্য, শিক্ষাবিদ, সিভিল সোসাইটি নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যমের প্রতিনিধিসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জনমানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবারের প্রতিপাদ্যের আলোকে (Invest in the future, Invest in Teachers!) গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাচিত সহযোগী সংগঠন ছাড়াও আরও অন্যান্য সহযোগী সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। এসব কর্মসূচি থেকে বিভিন্ন সুপারিশ উঠে আসে।

সুপারিশসমূহ

- শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মনোন্নোয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
- মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে একটি 'জাতীয় শিক্ষা সেবা কোর' গঠনসহ যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।
- শিক্ষানীতি ২০১০-এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন ও মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।
- শিক্ষকদের কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো, জনবল, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।
- সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন দলিত, হরিজন, যৌনকর্মী অধ্যুষিত এলাকা, চা বাগান, চর-হাওর, পাহাড়ি ও দুর্গম অঞ্চলে কাজ করতে আগ্রহী, শিক্ষক নিয়োগে কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- শ্রেণীকক্ষ/পাঠদান বহির্ভূত কাজে শিক্ষকদের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- শিক্ষকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে জনঅংশগ্রহণ বাড়াতে হবে এবং স্থানীয় সরকারের শক্তিশালী ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষকদের মানোন্নয়নসহ শিক্ষার সকল পর্যায়ে শিক্ষক সংগঠনগুলোকে কার্যকরী অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।
- শিক্ষকদের নৈতিক স্খলন/পেশাগত অসদাচরণ বিষয়ে শিক্ষক সংগঠনসমূহকে যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে শিক্ষার উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করতে হবে।
- জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুসারে সংবিধিবদ্ধ স্থায়ী 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষকদের বেতন ভাতাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রবর্তন করতে হবে।
- শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাখাতে কমপক্ষে জিডিপি'র ৬% অথবা জাতীয় বাজেটের ২০% বরাদ্দ প্রদান ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন চূড়ান্ত করতে হবে।
- শিক্ষকদের অবসর ভাতা দ্রুত সময়ে প্রদান করতে হবে।

আমরা আশা করি, শিক্ষকদের দক্ষতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে শিক্ষার মানন্নোয়ন ঘটবে। এ লক্ষ্যে অভিযান প্রতিনিয়ত এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

রেহানা বেগম
উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, গণসাক্ষরতা অভিযান

উন্নয়নসূচিতে আগাম সাফল্য
প্রাথমিক-মাধ্যমিকে অর্ধেকই ছাত্রী

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ঠিক করা সময়সূচির আগেই বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীর সমতা অর্জিত হয়েছে। উপরন্তু, মাধ্যমিক স্তরে মোট শিক্ষার্থীর ৫৩ শতাংশই ছাত্রী। উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায়ও মেয়েদের অংশগ্রহণ প্রতি বছর বাড়ছে।

জেনেভাভিত্তিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের 'বিশ্ব লিঙ্গবৈষম্য প্রতিবেদন ২০১৪'-এ প্রাথমিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের (এনরোলমেন্ট) সূচকে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের সূচকেও এই অঞ্চলের প্রথম সারির ১০টি দেশের একটি বাংলাদেশ। এই প্রতিবেদনে নারীশিক্ষায় গত বছর ১৩৬টি দেশের মধ্যে ১১৫তম অবস্থানে থাকলেও এবার বাংলাদেশ ১১১তম অবস্থানে উঠে এসেছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, আগামী তিন বছরে উচ্চমাধ্যমিক ও সাত বছরে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ সমান করা হবে। তিনি বলেন, মানুষের সচেতনতা ও উপবৃত্তিসহ সরকারের নেওয়া বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগের ফলে নারীশিক্ষায় এই অগ্রগতি হয়েছে। এর ফলে এখন ওপরের শ্রেণিগুলোতেও নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে যত শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে, তার মধ্যে ৫০ দশমিক ১ শতাংশ ছাত্রী। বাকিরা ছাত্র। সংখ্যার হিসেবে প্রাথমিকে এখন ৯৮ লাখ চার হাজার ২০ জন ছাত্রী পড়াশোনা করছে। আর ছাত্র পড়ছে ৯৭ লাখ ৮০ হাজার ৯৫৩ জন। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীর সংখ্যা আরও বেশি: ৫৩ শতাংশ। আর ছাত্র ৪৭ শতাংশ। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় পাসের হারেও ছাত্রীরা প্রতি বছর এগিয়ে চলছে। ২০০৯ সালে যেখানে ছাত্রীদের পাসের হার ছিল ৬৫ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ, সেখানে ২০১৪ সালের পরীক্ষায় ছাত্রীদের পাসের হার ৯২ দশমিক ১২ শতাংশ। অবশ্য গত কয়েক বছরে মোট পাসের হারও বাড়ছে।

জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধূরী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নারীশিক্ষার সমতা অর্জনের সবচেয়ে বড় কারণ হলো, রাজনৈতিক অঙ্গীকার। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় পরিবর্তন হলেও শিক্ষা, বিশেষ করে নারীশিক্ষার প্রতি অঙ্গীকারটি আরও শক্ত হয়েছে।

ব্যানবেইসের হিসেবে চিকিৎসা, আইনসহ পেশাগত শিক্ষায়ও এগিয়ে চলছে নারী। তিন বছর আগে ২০১১ সালে পেশাগত শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৩৬ শতাংশের কিছু বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এখন যত শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে তার ৩৩ শতাংশ নারী। ২০১২ সালেও এই হার ছিল ৩০ শতাংশ।

তবে তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গিয়ে নারীর অংশগ্রহণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম বাড়ছে। এর কারণ জানতে চাইলে রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, নিরাপত্তার অভাবের কারণে এখনো অনেক মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের উচিত হবে নিরাপত্তা জোরদার করা এবং সচেতনতা বাড়ানো। সচেতনতা ও উদ্যোগ বাড়ালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কিছু বাধার কারণে এটা হচ্ছে। যেমন মেয়েদের বাড়ির বাইরে গিয়ে পড়ার জন্য প্রথমত থাকার বিষয়টি একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেয়েদের জন্য আবাসিক সুবিধাও পর্যাপ্ত নয়। এজন্য এখন সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস করলে ছাত্রীদের জন্যও আরেকটি করা হবে।

প্রথম আলো ৪.১১.২০১৪

বেদখল ৫১ প্রাথমিক বিদ্যালয়

ঢাকা মেট্রোপলিটনের ৫১টি বেদখল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্ধারে মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সংসদীয় কমিটি। এসব বিদ্যালয় উদ্ধারবিষয়ক সংসদীয় কমিটির বৈঠকে উত্থাপিত প্রতিবেদনে ঢালাওভাবে- 'জেলা প্রশাসকের বরাবর প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে বা উচ্ছেদ মামলার প্রস্তুতি চলছে' উল্লেখ করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে কমিটি। বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে কোনো জায়গায় কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার সুপারিশ করেছে কমিটি।

বুধবার সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির অষ্টম বৈঠকে উত্থাপিত বিগত বৈঠকের কার্যপত্র থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সভাপতি মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে বৈঠকে কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান, আখম জাহাঙ্গীর হোসাইন, আবদুর রহমান, আলী আজম, মোহাম্মদ ইলিয়াছ এবং উম্মে রাজিয়া কাজল অংশ নেন। জানা গেছে, ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির সদস্য আখম জাহাঙ্গীর হোসাইন এসব প্রশ্ন তোলেন। এ সময় রস্ক প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত আনন্দ স্কুল এর প্রতিবেদন নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আনন্দ স্কুলের তথ্য নিয়ে কালক্ষেপণ করছে মন্ত্রণালয়। বৈঠকে সভাপতি বলেন, এর আগে মন্ত্রণালয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটনের ৫১টি বেদখল হওয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকা দেয়া হলেও সারা দেশেই একই অবস্থা। তিনি বলেন, দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে সমস্যা আরও ভয়াবহ হতে পারে। কমিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। শিক্ষকদের শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগেরও সুপারিশ করা হয়।

আলোকিত বাংলাদেশ ৫.১১.২০১৪

দক্ষতা ছাড়া শিক্ষা মূল্যহীন: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষা হতে হবে জীবনমুখী। দক্ষতাবিহীন শুধু সনদভিত্তিক শিক্ষা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির কোনো কাজে আসে না। যুগোপযোগী কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষাই জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির পথ। শিক্ষার সঠিক প্রয়োগ ঘটিয়ে দেশের বেকারত্ব দূর করতে হলে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই। গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

মন্ত্রী বলেন, নতুন প্রজন্মকে গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। বাংলাদেশের যাত্রার প্রক্কালে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশের মাথাপিছু আয় আমাদের চেয়ে কম ছিল। তারা প্রাকৃতিক সম্পদেও সমৃদ্ধ নয়। অথচ আজ তারা সমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। তারা জাতীয় লক্ষ্য নিয়ে দেশের নতুন প্রজন্মকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলেছে। তারা মানবসম্পদে সমৃদ্ধ দেশ। মন্ত্রী বলেন, এসব দেশ ছাড়াও জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ডসহ উন্নত দেশসমূহে ৮০-৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা নয়, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষা নেয়।

আমাদের সময় ৮.১১.২০১৪

সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বস্থানে রাখার দাবি

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থানান্তর না করে রক্ষার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বিদ্যালয় রক্ষা কমিটি। গতকাল বেলা ১১টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ সংবাদ সম্মেলনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধূরী তিনটি দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলো- বিদ্যালয়টি

যেভাবে ছিল সেভাবেই রাখা, বিদ্যালয়ের গেট খুলে দেওয়া এবং সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুসারে অন্য কোথাও স্থানান্তর না করে স্ব-স্থানে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া। সংবাদ সম্মেলন শেষে রাশেদা কে. চৌধূরী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের অসুবিধার কথা শোনেন। এ সময় বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সংবলিত প্লাকার্ড নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রক্ষা কমিটির সভাপতি নাদিম চৌধুরী। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রওশন আরা বেগম, ছাত্র-শিক্ষক/-অভিভাবক ফোরামের মহাসচিব মঞ্জুর হোসেন ইসা, বিদ্যালয় রক্ষা কমিটির সদস্য আজমিন আরা রাশেদা প্রমুখ।

সমকাল ৯.১১.২০১৪

মেয়েদের বিয়ের বয়স না কমানোর আহ্বান

মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ থেকে ১৬ বছরে নামিয়ে আনা একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে। এই সিদ্ধান্ত নারীর মানবাধিকার ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এমন সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি।

গতকাল রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ৬৮টি নারী মানবাধিকার এবং উন্নয়ন সংগঠনের মোর্চা সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি এই আহ্বান জানায়। কমিটির পক্ষে মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম বিয়ের বয়স না কমিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, মেয়েদের বিয়ের বয়স কমানোর সরকারি উদ্যোগের কথা জানার পরপরই সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি এর প্রতিবাদ জানায়। গতকালের সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকেরা জানতে চান প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়ায় সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে এ ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছেন কি না? উত্তরে আয়শা খানম বলেন, মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি ও জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী এ বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিয়ের বয়স না কমানোর ব্যাপারে মত দিয়েছেন। তাঁরা যেহেতু সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আছেন, তাই আশা করা যায় তাঁরা সরকারের ভেতরের কথাই বলছেন।

আয়শা খানম বলেন, সরকার তার অবস্থান থেকে সরে না আসা পর্যন্ত সামাজিক কমিটির কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশব্যাপী নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালিত হবে। তাতে নির্দিষ্ট করে বিয়ের বয়স কমানোর সরকারি উদ্যোগের প্রতিবাদ জানানো হবে। সংবাদ সম্মেলনে স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন কর্মকার বলেন, বিয়ের বয়স কমানো হলে বাল্যবিবাহকে আইনগত বৈধতা দেওয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের উপ-পরিচালক রওশন জাহান পারভীন, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের উপপরিচালক শাহানাজ চুমকি, মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশনের নাজরানা ইয়াসমিন, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউণ্ডেশনের প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক লতিফা বানুসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

প্রথম আলো ১০.১১.২০১৪

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে চাই পৃথক অধিদফতর

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে একটি পৃথক অধিদফতর চালুর দাবি জানিয়েছে প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট একটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তারা বলেছেন, নারীর প্রতিনিধিত্ব যেমন পুরুষ করতে পারে না; তেমনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব অপ্রতিবন্ধী কোন ব্যক্তি করতে পারে না। প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সবখানে অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবস্থানের ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সুযোগ পাচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তারা।

শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে বক্তারা এসব কথা বলেন। মানববন্ধনে বিভিন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সংগঠন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, অভিভাবক, বিভিন্ন পেশাজীবী ও এনজিও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে এই দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। কর্মসূচি থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য কিছু দাবিও উত্থাপন করা হয়। মানববন্ধনে তিন দফা দাবি জানিয়ে তারা বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩-এ উল্লেখিত সকল কমিটিতে প্রতিবন্ধী মানুষদের এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের কমিটি ও তাদের অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন নীতি সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়নে তাদের প্রতিনিধিত্বের বিকল্প নেই এবং প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ উল্লেখিত বেসরকারি সদস্য হিসেবে পুরুষ ও নারীর জন্য সংরক্ষণের আহবান জানানো হয়। একই সাথে এ ব্যাপারে নতুন আইনের বিধিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার দাবি জানানো হয়।

এই কর্মসূচিতে পিএনএসপি'র আহবায়ক সালমা মাহবুব, এসডিএসএ-এর সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ জাতীয় বধির সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ, মহিলা বধির কল্যাণ সংস্থার নাজনীন আক্তার রীতা এসইউসিসি'র সভাপতি আশিকুর রহমান অমিত, টার্নিংপয়েন্টের সাধারণ সম্পাদক জীবন উইলিয়াম গমেজ, তরী ফাউন্ডেশনের পরিচালক অধ্যাপক ডা. শুভাগত চৌধুরী, নিরাপদ সড়ক চাই'র সভাপতি ইলিয়াস কাঞ্চন বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া মানববন্ধনে একাত্মতা প্রকাশ করেন ওয়ার্কিং ফর বেটার বাংলাদেশ, ফেইথ বাংলাদেশ, ইউথ এন্ডিং হাঙ্গার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এক্টিভ ইউনিট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্লাইন্ড স্টুডেন্ট সংঘ, রোটারি ক্লাব অব মুক্ত স্বদেশ, নাইটার, চেঞ্জ দ্যা লাইভস, আমজনতা, বাংলাদেশ সোসাইট ফর দ্যা চেঞ্জ অ্যাডভোকেসি নেক্সাস (বি-স্ক্যান), বাংলাদেশ বধির ছাত্র কল্যাণ সংস্থা, জাতীয় প্রতিবন্ধী সেবা সংঘ, গাজীপুর।

ইত্তেফাক ২২.১১.২০১৪

শিক্ষা খাতে বাজেট ক্রমেই কমছে: শিক্ষামন্ত্রী

সারা বিশ্বে যখন শিক্ষায় বাজেট বাড়ছে, আমাদের তখন ক্রমেই তা কমতে শুরু করেছে। আমি যখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাই, তখন শিক্ষা খাতে বাজেট ছিল ১৪ শতাংশ। পরের বছর তা কমে হয় ১৩ শতাংশ। এখন ১১ শতাংশে নেমেছে। অথচ শিক্ষাকেই সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেয়া উচিত ছিল। গতকাল চট্টগ্রামে ফুলকি স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এসব কথা বলেন। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া আমরা এখনো বন্ধ করতে পারিনি। তারপরও গত পাঁচ বছরে দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সব ধরনের পরিবার থেকে ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসছে। ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারির মধ্যে প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ৪ কোটি ৪৪ লাখ শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেয়া হবে।

এর আগে শিক্ষামন্ত্রী চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ ও মির্জা আহমেদ ইস্পাহানি হাই স্কুল পরিদর্শন করেন। পরে সিটি কলেজ পরিদর্শন শেষে নগরীর প্রবর্তক স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, সিটি কলেজ ও কমার্স কলেজ নিয়ে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা তুলে ধরেন। স্কুল-কলেজ পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান, বিদ্যালয় পরিদর্শক কাজী নাজিমুল ইসলাম, উপ-সচিব মো. মাহবুব হাসান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আবদুল আজিজ উপস্থিত ছিলেন।

বণিক বার্তা ২৭.১১.২০১৪

তথ্য অধিকার আইন শীর্ষক মতবিনিময় সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এর সহযোগী সংগঠন পল্লী সাহিত্য সংস্থা-এর যৌথ উদ্যোগে ৮ নভেম্বর ২০১৪ জেলা পরিষদ মিলনায়তন, পঞ্চগড়ে অনুষ্ঠিত হয় 'সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন' শীর্ষক মতবিনিময় সভা। সভায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মো. রফিকুল হাসান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধে তিনি 'তথ্য অধিকার আইন' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করেন এবং এই আইনের যথাযথ ব্যবহার মাধ্যমে কিভাবে সাধারণ জনগণ শিক্ষা বিষয়ক তথ্য ও সেবাসমূহ পেতে পারে তা তুলে ধরেন। স্থানীয় শিক্ষাবিদ, শিক্ষক সমিতি, গণমাধ্যম, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সিভিল সোসাইটির প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জেলা মহিলা সংস্থার সভাপতি রিজিয়া বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব শামসুল আজম ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যাপক মনি শংকর দাশ গুপ্ত। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাস-এর নির্বাহী পরিচালক হারুন অর রশিদ ও

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কার্যক্রম কর্মকর্তা আব্দুল কুদ্দুছ প্রিন্স।

আব্দুল কুদ্দুছ প্রিন্স

কেমন বই চাই

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহের লক্ষ্যে ৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও স্থানীয় সহযোগী সংগঠন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)-এর উদ্যোগে সিরাজগঞ্জের কোনাবাড়ি ইসহাক উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'কেমন বই চাই' শীর্ষক বিদ্যালয়ভিত্তিক ক্যাম্পেইন কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পেইন কর্মসূচিতে কোনাবাড়ি ইসহাক উচ্চ বিদ্যালয় ও কোনাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। সারাদিনের কার্যক্রম মূলত তিনটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথমাংশে অনুষ্ঠিত দলীয়

কাজে পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণীর প্রায় একশ শিক্ষার্থী সরাসরি পাঠ্যবই ও অন্যান্য সহায়ক বই সম্পর্কে তাদের মতামত জানায়। শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নয়, বইয়ের প্রচ্ছদ, কাগজ, ছবি ও ছাপার মান এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের পাঠদান কৌশল নিয়েও তারা মতামত দেয়।

দ্বিতীয় ভাগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীরা দলীয় কাজের মধ্যদিয়ে প্রাপ্ত মতামতসমূহের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করে। শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এভারেস্ট বিজয়ী পর্বতারোহী এম.এ. মুহিত এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রসাশক মো. বিল্লাল হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনডিপি'র পরিচালক (প্রোগ্রাম) পরেশ চন্দ্র সরকার এবং এই ক্যাম্পেইন কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মো. মোস্তাফিজুর রহমান। সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, এনজিও এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিবৃন্দসহ প্রায় পাঁচশ জন। অনুষ্ঠানের শেষভাগে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সান্ত্বনা আইউব

স্কুলে ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষা সমাপ্তি বিষয়ক ক্যাম্পেইন কর্মসূচি

১০ নভেম্বর ২০১৪ গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রশিক্ষণ কক্ষে জনপ্রিয় যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে স্কুলে ভর্তি নিশ্চিতকরণ, শিক্ষাক্ষেত্রে টিকে থাকা ও শিক্ষা সমাপ্তি বিষয়ক ক্যাম্পেইন কর্মসূচির এক পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অভিযানের সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ যাত্রা শিল্প উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দে। অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতির মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। শুভেচ্ছা ও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক তাসনীম আত্হার। কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মো. মোস্তাফিজুর রহমান কর্মসূচির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন।

তাসনীম আত্হার বলেন, সকল সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হল নিজ নিজ কর্ম এলাকার পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের সচেতন করা এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে ভর্তির বিষয়টির ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে। মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০০% ভর্তি নিশ্চিত হচ্ছে বলা হলেও দেখা যাচ্ছে প্রতিবন্ধী অনেকে এখনও বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না। সভায় ক্যাম্পেইন কর্মসূচি আয়োজনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয়, এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- রিক্সা র‍্যালী, উঠান বৈঠক, যাত্রাপালা।

সভাপতি মিলন কান্তি দে বলেন সচেতনতামূলক কাজ করতে হলে অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হবে। যে কোন সমস্যা সকলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান

করতে হবে। উক্ত সভায় অভিযানের বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার ৩৮ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

আবেদা সুলতানা

ফিলিপাইনে কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক পরিদর্শন কার্যক্রম

২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযানের ইএফএপিআইডি ইউনিটের আয়োজনে ৬ দিনব্যাপী ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত হলো কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক এক পরিদর্শন কার্যক্রম। এ পরিদর্শন কার্যক্রমে সরকারি কর্মকর্তা, গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগী সংস্থা এবং অভিযানের প্রতিনিধিসহ সর্বমোট ১২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ পরিদর্শন কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ক পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখা। ৬ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত পরিদর্শন কার্যক্রমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা ফিলিপাইনে অবস্থিত Technical Education & Skill Development Authority (TESDA), শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন Department of Education (DepEd), ম্যানিলায় অবস্থিত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর প্রধান

কার্যালয়, মান্দালুয়োন সিটি কর্পোরেশন, কৃষি মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়।

উক্ত পরিদর্শন কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার যে সকল প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল-এর প্রধান নির্বাহী, অতিরিক্ত সচিব এ বি এম খোরশেদ আলমের নেতৃত্বে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত সচিব শাহজাহান মিয়া, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এ কে ফজলুল হক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আ: শাহিন কাওছার শাহিন সরকার এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারি সচিব আছমা নাসরিন এবং বেসরকারি সংস্থা বেইস, বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি, উন্নয়ন সহযোগী টিম এর প্রধান নির্বাহীগণ এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিনিধিবৃন্দ। সার্বিক পরিদর্শন কার্যক্রম সমন্বয় করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ। ফিলিপাইনে অবস্থিত বেসরকারি সংস্থা ই-নেট ফিলিপাইনের সার্বিক সহযোগিতায় এই পরিদর্শন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

মির্জা মো. দেলোয়ার হোসেন

আনন্দময় ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

আনন্দ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বা বাসনা। সব মানুষই চায় সুন্দর, সাবলীল ও আনন্দঘন পরিবেশে বসবাস

করতে। আনন্দ মানুষকে উদ্দীপ্ত করে, অনুপ্রেরণা যোগায়।

এই উদ্দ্যেশ্যকে সামনে রেখে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় ৮টি এনজিও-র মাধ্যমে ৩২টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় আনন্দময় ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন পর্যায়ক্রমে পরিচালনা করে আসছে। এ উদ্যোগের আওতায় সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, ও হবিগঞ্জ জেলায় নভেম্বর মাসে আনন্দময় ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ৪ ব্যাচ ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ওরিয়েন্টেশনসমূহে শিক্ষক, এসএমসি-র সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ মোট ১৩৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাসমূহে অধিবেশন পরিচালনা করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। গণসাক্ষরতা অভিযান থেকে উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক জামিল মুস্তাক কোর্স সমন্বয়কারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

জামিল মুস্তাক

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য এসআরএইচআর বিষয়ক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন

সাংবাদিকদের লেখনীর মাধ্যেমে কিশোর-কিশোরীসহ সমাজের অন্যান্য অংশীজনদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য, প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাকটিভ হেলথ্ রাইটস্-এডুকেশন প্রকল্পের আওতায় গণমাধ্যম কর্মীদের (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) জন্য মাঠ পর্যায়ে বেশ কয়েকটি এসআরএইচআর-এর কার্যক্রম পরিদর্শনের আয়োজন করে।

এই ধারাবাহিকতায় নেত্রকোণা জেলায় ২৬ থেকে ২৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ১২ জন গণমাধ্যমকর্মীর জন্য বিএনপিএস, বারহাট্টা থানার বেশ কয়েকটা স্কুল পরিদর্শন কার্যক্রম আয়োজন করা হয় এবং ৩০ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে পর্যন্ত রংপুর জেলায় ব্র্যাক ও এফপিএবি-র সহায়তায় আরো একটি পরিদর্শন কার্যক্রম আয়োজন করা হয়। এই কার্যক্রমেও রংপুর জেলার বিভিন্ন সংবাদপত্রের মোট ১২ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। পরিদর্শন কালে গণমাধ্যমকর্মীরা ক্লাস চলাকালীন সময় ক্লাস রুমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাও করেন।

আব্দুল কুদ্দুছ প্রিন্স

এসআরএইচআর বিষয়ক গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে অনানুষ্ঠানিক সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান এসআরএইচআর প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যেই ৪টি জেলা শহর এবং উপজেলা পর্যায়ে সাংবাদিকদের নিয়ে বেশ ক'টি কর্মশালা ও পরামর্শ সভার আয়োজন করেছে। এই ধারাবাহিকতায় ৪টি জেলায় পর্যায়ক্রমে ১৫ নভেম্বর রূপান্তর, খুলনা, ২০ নভেম্বর ইপসা, চট্টগ্রাম, ২৫ নভেম্বর বিএনপিএস, নেত্রকোণা এবং ২৯ নভেম্বর রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ), যশোরে স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য অনানুষ্ঠানিক সভার আয়োজন করে। ৪টি জেলার প্রতিটি সভায় ২০ জন করে মোট ৮০ জন স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীর সাথে এই ইনফরমাল সভা করা হয়।

১৫ নভেম্বর ২০১৪ রূপান্তর, খুলনায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বপন কুমার গুহ, নির্বাহী পরিচালক, রূপান্তর, অসীম আনন্দ দাস, প্রোগ্রাম অফিসার, রূপান্তর। অভিযানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন রেহানা বেগম, উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক এবং খুলনা জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ। ২০ নভেম্বর ২০১৪ ইপসা, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন তাসনীম আত্হার পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান, মো. সহিদুল ইসলাম ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইপসা, মো. তৌহিত মুরাদ প্রোগ্রাম অফিসার, ইপসা এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ২০ জন সাংবাদিক। ২৫ নভেম্বর বিএনপিএস, নেত্রকোণা জেলায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজশ্রী গায়েন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, গণসাক্ষরতা অভিযান, নাসরিন আক্তার, প্রোগ্রাম

অফিসার, বিএনপিএস এবং নেত্রকোণা জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ২০ জন সাংবাদিক। ২৯ নভেম্বর রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ), যশোর জেলায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন মো. মোস্তাফিজুর রহমান কার্যক্রম ব্যবস্থাপক, গণসাক্ষরতা অভিযান, ফিলিপ বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক আরআরএফ, মো. মগবুল হোসেন প্রোগ্রাম অফিসার, আরআরএফ এবং যশোর জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ২০ জন সাংবাদিক।

মো. রফিকুল ইসলাম রফিক

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা-২০১৪

যে সকল শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে: সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এন্ট্রি শ্রেণিতে এবং আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে সাধারণভাবে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

শিক্ষার্থীর বয়স: ১ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স শিক্ষাবর্ষের ১ জানুয়ারিতে ৫ (পাঁচ) থেকে ৭ (সাত) বছর বয়সের মধ্যে হতে হবে। শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণের জন্য ভর্তির আবেদন ফরমের সাথে জন্ম নিবন্ধনের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি:

ক. ১ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবশ্যিকভাবে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে। লটারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রস্তুত করার পাশাপাশি শূন্য আসনের সমান সংখ্যক অপেক্ষা মান তালিকাও প্রস্তুত রাখতে হবে। ভর্তি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে নির্বাচিত শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ. ২য়-৮ম শ্রেণির শূন্য আসনে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রম অনুসারে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। নবম শ্রেণির ক্ষেত্রে জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের প্রস্তুতকৃত মেধাক্রম অনুসারে নিজ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির পর অবশিষ্ট শূন্য আসনে অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য কমিটি কর্তৃক বাছাই করতে হবে। অবশ্য গ্রুপ গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবে।

গ. ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শূন্য আসন সংখ্যা উল্লেখপূর্বক ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন। এ ছাড়া ভর্তি কমিটি জাতীয়/স্থানীয় পত্রিকায়/ওয়েবসাইট ইত্যাদিতে বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নিবে।

ভর্তির আবেদন ফরমের মূল্য ও ভর্তি ফি: ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য সর্বোচ্চ ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা গ্রহণ করা যাবে। সেশন চার্জসহ সর্বোচ্চ ভর্তি ফি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং শিম/অডিট সেল/২৪৩/২০১১/৪৭৫ তারিখ: ০৬/০৭/২০১৪ অনুযায়ী আদায় করা যাবে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকার শর্তে ভর্তির ক্ষেত্রে ২% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ধরণ উল্লেখ করতে হবে এবং প্রমাণস্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষার জন্য ব্যয় নির্বাহ:

ক. ভর্তির আবেদন ফি বাবদ বিদ্যালয় প্রাপ্ত অর্থের ৫০% অর্থ দিয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ যেমন– বিজ্ঞপ্তি প্রচার, আবেদন ফরম প্রস্তুত ও উত্তরপত্র মুদ্রণ, যাতায়াত, ফরম বিতরণ, আসন বিন্যাস, পরীক্ষা গ্রহণ, আপ্যায়নসহ বিদ্যালয়ে কর্মরত সকলের সম্মানী/পারিশ্রমিক, বিবিধ খরচ ইত্যাদির জন্য ব্যয় নির্বাহ করা যাবে।

খ. অবশিষ্ট ৫০% অর্থ ভর্তি কমিটির নিকট জমা দিতে হবে। এ অর্থ থেকে কমিটি ভর্তি সংক্রান্ত সভার খরচ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন ও মুদ্রণ, প্রশ্নপত্র ভেন্যুতে প্রেরণ, কোড নম্বর প্রদান, উত্তরপত্র মূল্যায়নের সম্মানী ও আপ্যায়ন, ডিকোডিংসহ ফলাফল তৈরি ইত্যাদির জন্য ব্যয় নির্বাহ করা যাবে।

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৪৬ অগ্রহায়ণ ১৪২১ নভেম্বর ২০১৪

স ম্পা দ ক

মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়কাল যে তার ভেতরে এত শোকের আঁধার লুকিয়ে রেখেছিল, আমরা কেউ তো তা জানতাম না। সারা বছরের হিসেব-নিকেশ করলে বুঝতে পারব, কতটা দীন এবং হৃতবিত্ত হয়ে গেলাম আমরা। পরিণত বয়সে মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন, সে তো শাশ্বত এক অনিবার্য বাস্তবতা। বাস্তবতা ও সত্য অতি কঠিন, তা জানি, তবু তাকে বারংবার ও স্বল্প বিরতিতে মেনে নেয়া ছিল আমাদের জন্য বড় কঠোর অভিজ্ঞতা। স্বল্প সময়সীমার মধ্যে আমরা যাদের হারিয়েছি, তারা এত ব্যাপকভাবে আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করেছিলেন যে, তাঁদের চিরতরে হারিয়ে যাওয়া আক্ষরিক অর্থেই আমাদের জন্য 'অপূরণীয়'। বিবিধ সামাজিক অথবা আরো জোর দিয়ে বললে রাজনৈতিক কারণে সমাজে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে, সমাজের উদারবাদী গণতান্ত্রিক ধারা বহুদিন ধরেই ঝুঁকিগ্রস্ত। সংকীর্ণতা, জীবনের বিবিধ অনুষঙ্গে অপ্রয়োজনীয়ভাবে এবং সুনির্দিষ্ট স্বার্থচিন্তার ধারায় ধর্মকে ব্যবহার করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এবং উদারবাদী ও বহুত্ববাদী সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়িষ্ণুতা আমাদের চারদিকে এক ভয়াবহ বিপন্নতা সৃষ্টি করেছে। এমন এক কন্টকাকীর্ণ সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতার সদর্থক প্রভাব সম্পর্কে যাঁদের অভিমত সাধারণ মানুষের মধ্যে অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারতো, তেমন চারজন প্রথিতযশা মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

অধ্যাপক সালাহ্উদ্দিন আহ্মদের মত মৃদুভাষী ভদ্রভাষী বিজ্ঞজন আমাদের সমাজে যে কোন সময়েই দুলর্ভ। তাঁর ইতিহাসচর্চার মধ্যে যে মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদিতা ছিল, তা আমাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ব্রিটিশ থেকে পাকিস্তানী শাসনের রূপান্তরের মধ্যে বাঙালির জাতীয় জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সাতচল্লিশে দেশভাগ হবার সময়েই। অধ্যাপক আহ্মদ ইতিহাস পঠন-পাঠনের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন, আমাদের দুভার্গ্য, তা অনুসরণের মত মানুষ এখন সমাজে ক্রমহ্রাসমান। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা একাডেমী আয়োজিত শোকসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। সহকর্মী হিসেবে নানা স্মৃতি রোমন্থন করেছিলেন। ইতিহাসের কী পরিহাস! মাত্র ক'দিন পর তিনি প্রফেসর আহ্মদের সঙ্গলাভে ইহলোক ত্যাগ করলেন। একটি শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই আবার একী অমোঘ আঘাত। আরো একজন উদারবাদী সমাজভাবুকের চিরপ্রস্থান। বর্তমান কী দুঃসহ, এমন বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে যখন আমরা প্রাণান্ত, তখন চলন্ত বাস প্রাণ কেড়ে নিল অভিজ্ঞ ও স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী সাংবাদিক জগলুল আহমেদ চৌধুরীকে। আর তা থেকে চব্বিশ ঘন্টার চেয়ে কম সময়ে আমাদের কাঁদিয়ে একবারে আকস্মিকভাবে চলে গেলেন আর একজন সমাজঘনিষ্ঠ নির্ভীকবাক জনপ্রিয় শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। হাজারো মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে এদেশের শিল্প আন্দোলন, রক্ষণশীলদের বাধা, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সমাজের ব্যাধি সম্পর্কে কথা বললেন। শেষ কথাটি অব্যক্ত থেকে গেল।

আমরা এঁদের সকলের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী
(*সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর বিভিন্ন সংখ্যার জন্য কাইয়ুম চৌধুরী বিভিন্ন বিরতিতে বেশ কয়েকটি প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন। তার কয়েকটি এখানে সংগ্রথিত করে বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদের কোলাজ তৈরি করা হলো।)

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন:৫৮১৫৩৪১৭, ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org